না বলা বাণী

গোপাল চক্রবর্তী

প্রতি বছর ১৫ই আগস্ট স্থানীয় আজাদ হিন্দ ক্লাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধান আকর্ষণ গুণীজন সংবর্ধনা, সমাজের একজন কৃতী মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রতি বছর। গত বছর বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অমর ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। মানপত্র, ফুল, উত্তরীয়, স্মারক আর কিছু প্রণামী। আপ্লুত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। এবারেও বেশ কয়েকদিন আগে থেকে মাইকে প্রচার চলছে এবারে সংবর্ধনা দেওয়া হবে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিমাদ্রি সেনকে। দুপুরের রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন বাণীপ্রভা দেবী। নামটা শুনে তাঁর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। হিমাদ্রি সেন, রতনপুরের হিমাদ্রি সেন নয়তো? সেনবাড়ির বড় ছেলে হিমু, হিমুদা।

বাণীপ্রভার চোখের সামনে ভেসে উঠল পূর্ববঙ্গের এক সমৃদ্ধ গ্রাম— রতনপুরের ছবি। বাণীপ্রভার বাবা হরেন ডাক্তার ছিলেন রতনপুরের এল এম এফ। আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের একমাত্র পাশ করা ডাক্তার। হাতযশও তেমনি, দুহাতে টাকা কামিয়েছেন। এক ছেলে দু'মেয়ের মধ্যে বাণী ছোট। বড় শশাঙ্ক, মেজ রাণী আর ছোট বাণী। অল্প বয়সে রাণীর বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল। রাণীর শ্বশুরের জাহাজের ব্যবসা। বাণী তখনও লেখাপড়া করে। বাংলা জুড়ে তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ, দাদার বন্ধু হিমাদ্রি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, দাদার বন্ধু হিসাবে এই বাড়িতে তার যাতায়াতও ছিল অবাধ। 'কাকিমা, 'কী রান্না হয়েছে?'— বলে সে অনায়াসে রান্নাঘরে ঢুকে যেতে পারতো। বড়লোকের সুদর্শন মেধাবী জলপানি পাওয়া ছেলেটিকে বাড়ির সবাই ভালবাসত। হিমাদ্রির সঙ্গে আড়ালে আবডালে দু-একটা কথা বলার সুযোগ খুঁজতো বাণী। হিমাদ্রিও যেন সেই অপেক্ষায় থাকতো। মাঝেমাঝে মাকে বলে হিমাদ্রিকে দিয়ে অংক আর ইংরাজি দেখিয়ে নিত বাণী। পড়ার ফাঁকে একদিন বাণী হিমাদ্রিকে বলল—

— আমিও আপনার মতো দেশের

কাজ করতে চাই হিমুদা, আমাকে আপনাদের দলে নেবেন?

— দেশের কাজে তোমার মতো মেয়ের খুব দরকার। পড়াশুনা কর, বড় হও নিশ্চয় সুযোগ পাবে।

ডাক্তারগিন্নি মনে মনে ভাবতেন ছেলেটা যদি ব্রাহ্মণ হতো, বাণীর সঙ্গে মানাতো খুব। তখনকার দিনে অসবর্ণ বিবাহ ভাবাই যেত না। হরেন ডাক্তাররা ছিল সামবেদী ব্রাহ্মণ, ডাক্তারের এক কাকা যদুর্বেদী ব্রাহ্মণের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বলে ডাক্তার তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেননি। বাণী বছর বছর জলপানি পেয়ে ক্লাস টেনে উঠল। সেই সময় রঘুনাথপুরের জমিদার বাড়ির ছোটো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব এলো। রঘুনাথপুরের জমিদার সম্প্রতি 'রায়-বাহাদুর' খেতাব পেয়েছেন। ইংরাজ মহলে বিরাট প্রভাব। বছরে লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি, তিন মহলা বাড়ি। ছেলে কলকাতার কলেজে পড়াশুনা করে। হরেন ডাক্তার এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এমন পাত্র তো হাতছাড়া করা যায় না। মাঘের শুভ লগ্নে মহাধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের বাজার থেকে পরিবেশন, প্রায় সব দায়িত্বই ছিল হিমাদ্রির ওপর। ছেলে শশাঙ্কশেখরের চেয়ে হিমাদ্রির উপর বেশি ভরসা করতেন ডাক্তারবাবু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হিমুর সঙ্গে দেখা হয়েছে বাণীর, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে আগের মতো ঔজ্জ্বল্য ছিল না। বড় নিষ্প্রভ ছিল সেই দৃষ্টি। একসময়ে একা পেয়ে বাণী জিজ্ঞাসা করল হিমাদ্রিকে–

— হিমুদা, মানুষ যা চায় তা পায় না, না?

একটু ভেবে উত্তর দিয়েছিল হিমাদ্রি—

— হয়তো তাই।

হিমাদ্রি যে তার মনে কতটা স্থান জুড়ে ছিল তা বিয়ের দিন প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করেছিল বাণীপ্রভা। তার মনে আদর্শ পুরুষ ছিল হিমাদ্রি। কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্রপাঠ করে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে তাকে সারা জীবন একসঙ্গে কাটাতে হবে। সেই অচেনা মানুষটি হবে তার সবচেয়ে আপনজন। আর ছোটবেলা থেকে যে মানুষটিকে মনে মনে সব থেকে আপনজন বলে মনে করে এসেছে, সে হয়ে যাবে পর। তাঁকে আপন মনে করাও হবে পাপ। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় বাণীর চোখ চারদিকে ঘুরেছিল একটি মানুষকে দেখার জন্য, কিন্তু কোথাও সেই মানুষটিকে দেখা গেল না। আত্মীয়-পরিজনদের কান্নার মধ্যে চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে পালকিতে বসেছিল বাণীপ্রভা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রায় মধ্যাহ্নে রঘুনাথপুরের জমিদার বাড়িতে পালকি পৌঁছাল। এক প্রাচীন প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বাসি বিয়ে আর নানারকম স্ত্রী-আচার সেরে তাকে বসানো হলো এক বড় ঘরে। পুরনো দিনের ভারি ভারি আসবাবপত্র পূর্বপুরুষদের ফ্রেমে বাঁধানো হাতে আঁকা বড় বড় ছবি। শাশুড়ি সাতনরি হার দিয়ে বৌমাকে আশীর্বাদ করলেন। রুপোর বাসনে এলো দুপুরের খাওয়া, অসংখ্য দাসদাসী, অতুল বিত্ত বৈভব। এত সমারোহের মধ্যেও বাণীর যেন আজ বেশি করে মনে পড়ছে সেই মানুষটার কথা, যে মানুষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগও কোনোদিন হয়নি। সন্ধ্যায় রতনপুর থেকে বাবা এলেন, দাদা এলেন, মেশোমশায় এলেন, বাণীর চোখ আরও একজনকে খুঁজেছিল, কিন্তু দেখা মেলেনি। বাবা বললেন,— দেখ্ না হিমুটাকে এত করে বললাম, আসতে পারল না অন্য কাজ পড়ে গেছে। সত্যিই কি কাজ পড়েছিল, না ইচ্ছে করেই আসেনি হিমাদ্রি?

বরকে শুভদৃষ্টির সময় একনজর দেখেছিল বাণীপ্রভা। তারপর আর চোখ খোলেনি। এক শুষ্ক, রুক্ষ, কঠিন চেহারার মানুষ। দ্বিতীয়বার দেখা ফুলশয্যার রাতে। কলকাতার কলেজে পড়া পাত্র ধীরাজ রায় চৌধুরী আকণ্ঠ মদ্যপান করে অনেক রাতে ঘরে এলো। এসেই ধরা গলায় বলল— ও তুমি এখনও জেগে আছ? আমার একটু দেরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, শোনো, তোমাকে খোলাখুলি বলি— আমি একটু নেশা-টেশা করি। আমাদের বাড়ির সব পুরুষরাই একটু-আধটু করে। ও নিয়ে কেউ দোষ ধরে না। আশাকরি তুমিও ধরবে না। আর আমি সব সময় সোজা কথাই বলি। আর সোজা কথা বলাটা আমি পছন্দ করি। আর আমাদের পূর্বপুরুষদের সবারই আরও কিছু কিছু দোষ ছিল, আমারও আছে। তাদের ধর্মপত্নীরা এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। আশাকরি, তুমিও ঘামাবে না। এসব কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ধীরাজ রায় চৌধুরী। আর সঙ্গে প্রচণ্ড নাসিকাগর্জন। এক চরম আতঙ্কের মধ্যে কাটল বাণীপ্রভার ফুলশয্যার রাত।

দিন যায়, রাত আসে আবার ভোর হয়। এভাবেই কাটতে লাগল বাণীপ্রভার দিনরাত্রি। এতবড় অট্টালিকা, এত লোকজন তবুও যেন বাণীপ্রভার মনে হয় সে এক নির্বান্ধবপুরীতে বাস করছে। একমাত্র ব্যতিক্রম নন্দা, নন্দারাণী বাণীপ্রভার দূর সম্পর্কের বিধবা ননদ। রায়বাহাদুরের ভাগ্নী নন্দা, বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যে সাপের কামড়ে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। অপয়া বলে শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হয়নি। তারপর থেকে মামাবাড়ির আশ্রিতা হিসাবে আছে। দু-চার দিনের মধ্যে নন্দার সঙ্গে ভাব হয়ে যায় বাণীপ্রভার। নন্দা মেয়েটির অল্প

বয়সে কপাল পুড়লেও অত্যন্ত সহজ, সরল, চালাক আর এই বাড়ির অন্দরমহলের অনেক খবর জানে। বাণীপ্রভার কাছে অকপটে অনেক কথা বলে। সহজ, সরলভাবেই সে বলে দিয়েছে ধীরাজ ঠাকুরপোর কলকাতায় বাঁধা মেয়েমানুষ আছে। বাবা জানতে পেরে চরম অশান্তি করেছে, টাকাপয়সা বন্ধ করে হুমকিও দিয়েছে। কিন্তু পুত্র অনড়, উল্টে সে বাবার কীর্তি ফাঁস করে দেবার হুমকি দিয়ে রেখেছে। সেই থেকে রায়বাহাদুর যেন চুপসে গেছেন। তাই তড়িঘড়ি করে সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, যাতে সুন্দরী বৌয়ের মুখ দেখে ছেলে সব ভুলে সংসারী হয়। একদিন দুপুরে নন্দাকে দিয়ে বাণীপ্রভাকে ডেকে পাঠালেন রায়বাহাদুর। বললেন—

— দেখো বৌমা, আমার ইচ্ছা নয় খোকা আবার কলকাতায় ফিরে যাক। লেখাপড়া যথেষ্ট হয়েছে, এবার জমিদারি দেখুক, নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিক, বড় খোকার উপর খুব চাপ পড়ে যাচ্ছে। তুমি যে করেই হোক ছোট খোকার কলকাতায় যাওয়া আটকাও।

— আমি কি পারবো বাবা?

পাশ থেকে শাশুড়ি বললেন,

— তোমাকে পারতেই হবে মা, ধরে নাও এটা তোমার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তোমাকে পাশ করতেই হবে। তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা আর একেবারে কচি খুকিটাও নও। আশাকরি, তুমি পাশ করেই যাবে।

না, সেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি বাণীপ্রভা। দুদিন পরে বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দিল ধীরাজ রায় চৌধুরী। আগের রাতে অনেক চেষ্টা করেছে বাণীপ্রভা। অনেক বুঝিয়েছে, চোখের জল ফেলেছে। বলেছে,

— আপনার সঙ্গে তো আমার পরিচয়ই হলো না এখনও। কালকেই চলে যাবেন?

জমিদার-তনয় বলেছিল, — এত অধৈর্য হচ্ছ কেন বৌ? তুমিও পালিয়ে যাচ্ছ না, আমিও পালিয়ে যাচ্ছি না। গ্রীষ্মের ছুটিতে আসছি তো।

রায়বাহাদুর হুঁশিয়ারি দিলেন, কথা না শুনলে মাসিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেবেন। ছেলে বলল,

— দিয়ে দেখুন না, পরে পস্তাতে হবে।

পরদিন সকালে কলকাতার ট্রেন ধরল ধীরাজ রায় চৌধুরী। রায়বাহাদুর বললেন, — পারলে না তো ছেলেটাকে আটকাতে?

শাশুড়ি বললেন,

— সংসারে মন আছে কিনা তাই তো ভাবছি।

একদিন দুপুরে শোবার ঘরে বাণীপ্রভাকে একা পেয়ে নন্দা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল— হ্যাঁরে ছোট, ছোটদাদার সঙ্গে তোর মেলামেশা হয়েছে?

বাণীপ্রভা একথার ইঙ্গিত বুঝতে পারল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। নন্দা আবার বলল—

— কী রে, বল না?

— না, রাতে তো উনি ওইসব নেশা-টেশা করে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেন।

— বেঁচে গেছিস, নষ্টা মেয়েছেলের কাছে যায় তো, যতসব গুপ্ত রোগের বাসা বেঁধেছে তার শরীরে।

বাণীপ্রভা বলল,

— তুমি কি করে জানলে?

— জানবো না? সাতক্ষীরা থেকে কোবরেজমশাই এল, বিয়ের আগে কতরকমের ওষুধ দিল। সারা বাড়িতে তো একেবারে ঢিঢি পড়ে গেছে।

এভাবে জমিদার বাড়ি আর জমিদারপুত্রের অনেক অজানা খবর পায় বাণীপ্রভা। তাতে শ্বশুরবাড়ি আর স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা যে বাড়ে তা নয়। ধীরাজ কলকাতায় যাবার দিন তিনেক পরে শাশুড়ি এলো বাণীপ্রভার ঘরে। বলল—

— তোমার আলমারির চাবিটা দাও তো বৌমা। তোমার অলঙ্কারগুলো কর্তার ঘরের বড় সিন্দুকে তুলে রাখি। যা দিনকাল পড়েছে, স্বদেশীরা বড়লোকের বাড়ি বেছে বেছে ডাকাতি করছে। কর্তার ঘরে বন্দুক আছে, ভয় নেই। স্বদেশী করে দেশ উদ্ধার করবে, ছিঃ!

— স্বদেশীরা তো এমনি সাধারণ মানুষের বাড়িতে ডাকাতি করে না মা। যে কটা করেছে সব তো সরকারি টাকা।

— বাঃ! স্বদেশীদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানো দেখছি। যোগাযোগ আছে নাকি স্বদেশী দলের সঙ্গে? শুনেছি তো তোমার বাপের বাড়ির ওদিকে স্বদেশীদের উৎপাত বেশি। আচ্ছা দাও তো দেখি, চাবিটা দাও।

— চাবি তো আমার কাছে নেই মা। সে তো আপনার ছেলের কাছে থাকতো। উনি মাঝেমাঝে আলমারি খুলতেন।

— চাবিটাও নিজের কাছে রাখতে পারোনি, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। দেখো না চাবিটা কোথায় রেখেছে? সে তো আর সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এঘরে চাবি পাওয়া গেল না। অগত্যা কর্তার কাছ থেকে নকল চাবি এনে আলমারি খোলা হলো। দেখা গেল, সেখানে অপর্ণার বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া একটা অলঙ্কারও নেই। আর তা নিয়ে গঞ্জনাও কম শুনতে হলো না বাণীপ্রভাকে। নন্দরাণী বলল—

দেখোগে, ওই অলঙ্কার ছোটবাবুর সেই বাঁধা মেয়েমানুষের গায়ে উঠেছে এতদিনে।

ধীরে ধীরে অলঙ্কার পর্ব মিটে গেল।

একদিন শাশুড়ি বললেন— খোকা তোমার কাছে চিঠিপত্র দেয়?

— না, মা।

— তা তুমি তো খোকার কাছে চিঠিপত্র লিখতে পার। লেখাপড়া জানা মেয়ে, দু-কলম চিঠি লিখলে কি তোমার মানহানি হয়?

শাশুড়ির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ধীরাজ রায় চৌধুরীর নামে চিঠি লিখল বাণীপ্রভা। কিছুদিন পরে জবাব এল, ছোটবাবু লিখেছে—

বাণীপ্রভা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। এভাবে আর চিঠি লিখবে না। পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতে হয়। উত্তর দেবার সময় পাব না। ভালো থেকো।

ইতি— তোমার স্বামী

চিঠিখানি শাশুড়ির হাতে দিয়েছিল বাণীপ্রভা। শাশুড়ি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—

কী আর বলবো, ছেলেটার মনটাও জয় করতে পারলে না। তুমি একটা অপদার্থ।

এভাবেই দিনরাত্রি কাটতে লাগল বাণীপ্রভার। হঠাৎ এল এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। মারাত্মক জখম হয়ে ধীরাজ রায় চৌধুরী ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি। কে বা কারা তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। খবর পেয়ে রায়বাহাদুর, টাকাপয়সা আর লোকজন নিয়ে ছুটলেন কলকাতায়। কিন্তু ধীরাজ রায় চৌধুরীকে আর বাঁচানো যায়নি। তার দেহও আনা হয়নি দেশের বাড়িতে। নিমতলা শ্মশানে দাহ করে সবাই ফিরল।

কোনোরকমে শ্রাদ্ধের কাজও মিটল, বাণীপ্রভাকেই শ্রাদ্ধ করতে হলো। আর তারপরই শ্বশুরবাড়িতে দুর্বিষহ হয়ে উঠল বাণীপ্রভার জীবন। ধীরাজ রায় চৌধুরীর অকালমৃত্যুর জন্য বাণীপ্রভাকেই দায়ী করল সবাই। ধীরাজকে সংসারে বাঁধতে পারেনি এই তার অপরাধ। একমাত্র নন্দা ছাড়া এ বাড়িতে বাণীপ্রভার আপন আর কেউ নেই। নন্দাই একদিন বলল— কেন এখানে পড়ে আছিস? চলে যা না বাপের বাড়ি।

বাবা, মা, দাদা অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু এক প্রচণ্ড অভিমানে এই নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে বাণীপ্রভা। অনিয়মিত আহার, অনিদ্রা, অত্যধিক পরিশ্রম, মানসিক অশান্তি সব মিলে অসুস্থ হয়ে পড়ল একদিন। বাপের বাড়িতে খবর গেল। এবার আর বাবা কোনো আপত্তি শুনলেন না, জোর করে নিয়ে এলেন বাড়িতে। নিজে চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে দিন কয়েকের মধ্যে সারিয়ে তুললেন মেয়েকে। বাণীপ্রভা তখন অন্য মানুষ, কারও সঙ্গে কথা নেই। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, নিজের প্রতি কোনো যত্ন নেই, যেন নিজেকে শেষ করে দেবার জন্যই উঠেপড়ে লেগেছে। এইসময় একদিন হিমাদ্রিকে ডেকে পাঠালেন ডাক্তারবাবু। বললেন,— দেখ হিমু, ভাবছি বাণী পড়াশুনাটা আবার শুরু করুক। ক্লাশ টেন অবধি তো পড়েছে, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিক। তুমি ওকে একটু পড়াও। ছাত্রী হিসাবে তো ও খারাপ ছিল না। আশাকরি তুমি ওকে পাশ করাতে পারবে।

হিমাদ্রি আপত্তি করেনি। কিন্তু সমস্যা হলো ছাত্রীটি কিছুতেই আবার পড়াশুনা করতে রাজি হল না। একদিন হিমাদ্রি ম্যাট্রিকের কয়েকটা বই নিয়ে এল বাণীপ্রভার কাছে। বই দেখে বাণী বলল— কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন? আমি তো বলেছি, আমি আর পড়াশুনা করবো না।

— কেন শুনি?

— আমার ইচ্ছে করে না।

— বাণী, তুমি একদিন বলেছিলে তুমি দেশের কাজ করতে চাও। সত্যি যদি দেশের কাজ করতে চাও, তবে তার আগে তোমাকে পড়াশুনা করতে হবে। নিজেকে তৈরি করতে হবে। বলো, রাজি আছো কিনা?

বাণী আর আপত্তি করেনি। সেইদিন থেকেই পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছিল। প্রথম বিভাগেই ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এবার দাদাই ডাক্তারবাবুকে রাজি করাল বোনকে কলকাতার কলেজে ভর্তি করানোর জন্য। ডাক্তারবাবুর অনুমতি নিয়ে একদিন দাদা হিমাদ্রিকে সঙ্গে নিয়ে বাণীপ্রভাকে বেথুন কলেজে ভর্তি করিয়ে দিল। লোকাল গার্জেন হিসাবে নাম থাকল হিমাদ্রির। হিমাদ্রি মাঝে মাঝে এসে বাণীপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। একটু আড়াল পেয়ে বাণী হিমাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করল—

— আসবেন তো?

হিমাদ্রি বলল— আসবো।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা সংগঠনের কাজে হিমাদ্রিকে প্রায়ই কলকাতা আসতে হয়। এলেই বেথুনের ছাত্রীনিবাসে বাণীপ্রভার সঙ্গে দেখা করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তখন চরমে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের অসারতা অনুভব করে সুভাষ বোস তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলিও তখন অত্যন্ত সক্রিয়। সেবার বড়দিনের ছুটি পাবার ক'দিন আগে হিমাদ্রি ছাত্রীনিবাসে গেল বাণীপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে। বাণীপ্রভা ভিজিটিং রুমে আসতেই হিমাদ্রি বলল,

— বাণী, তুমি একদিন বলেছিলে তুমি দেশের কাজ করতে চাও।

— হ্যাঁ, বলেছিলাম। এখনও বলছি আমি দেশের কাজ করতে চাই।

— সে সুযোগ হয়তো এসে গেছে। কাল বিকেলে আমি এসে তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সুপারকে বলবে

তোমার অসুস্থ পিসিমাকে দেখতে যাবে। আমি ঠিক চারটেয় আসবো

পরদিন চারটেয় বেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ধরে হিমাদ্রি বাণীপ্রভাকে নিয়ে যায় বাগবাজারের একটা গলির মুখে। গলির ভিতরে একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দরজার কড়া নাড়তে এক বয়স্কা মহিলা দরজা খুলে দিয়ে বললেন,

— এসো।

ওরা দুজনে ঘরে এলো। একটা মাঝারি মাপের ঘর। একপাশে একটা তক্তপোশ। একটা টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার। দেওয়ালে রাণাপ্রতাপ আর শিবাজীর ছবি। বইয়ে ঠাসা দুটো বুক সেলফ— রামায়ণ, মহাভারত থেকে কার্ল মার্ক্স-এর 'দাস ক্যাপিটাল' পর্যন্ত। ওদের বসতে বলে ভদ্রমহিলা ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে রেকাবিতে দুটো করে সন্দেশ আর দু-গ্লাস জল দিয়ে বললেন,

— খেয়ে নাও, দাদা আসছেন।

ওদের খাওয়া শেষ হতেই ঘরে এলেন একজন মাঝবয়সী মানুষ। পরনে ধুতি হাফশার্ট। মাথার অর্ধেকটা টাক। হিমাদ্রি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দেখাদেখি বাণীপ্রভাও করল। ভদ্রলোক বললেন,

— এ বাণীপ্রভা?

— হ্যাঁ।

— পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

— ভালো।

— পরীক্ষা কবে?

— বড়দিনের ছুটির পর।

— শুনলাম তুমি নাকি দেশের কাজ করতে চাও?

— হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

— কিন্তু আমাদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে যে প্রতি পদে পদে বিপদ, তা জানো?

— আমি বিপদে ভয় পাই না।

— বাঃ। শোনো, তোমাকে আমি চিনি না। হিমাদ্রির উপর আমার বিশ্বাস আছে। ওর কথায় তোমাকে আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিচ্ছি। এই কাজটায় যথেষ্ট ঝুঁকিও আছে।

—এই কাজটা করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

ভদ্রলোক টেবিলের উপর থেকে একটা মোটা বই তুলে নিলেন— হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্য। বললেন,

— এই বইটা তুমি আজ নিয়ে যাবে। বাড়ি যাওয়ার সময় অন্যান্য বইপত্রের সঙ্গে এটাও সাবধানে নিয়ে যাবে। তোমার বাড়ি থেকে হিমাদ্রি বইটা নিয়ে যাবে। ভাবছো এটা একটা সাধারণ বই, মোটেও না, এই দেখ।

ভদ্রলোক বইটা খুললেন, বাণী অবাক হয়ে দেখল বইয়ের মাঝখানের অনেকগুলি পাতা কেটে একটা খাপ করা, তার মধ্যে একটা ছোট বন্দুক বসানো। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। ভদ্রলোক আবার বললেন,

— এর নাম রিভলবার, এতে দুটি গুলি ভরা আছে। কি এবার ভয় করছে?

— না।

বাণীপ্রভা সপ্রতিভ উত্তর দিল।

— তোমার এই কাঁধের ব্যাগটার মধ্যে এটা রেখে দাও।

একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনা সেদিন অনুভব করেছিল বাণীপ্রভা। বইটা সযত্নে ব্যাগে ভরে নিয়েছিল।

এমন সময় হঠাৎ কলিংবেল বাজে। চমকে উঠল বাণীপ্রভা। সম্বিত ফিরে আবার চলে আসে ষাট বছর পরের স্বাধীন ভারতবর্ষে। দরজা খুলে দেখেন কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের একজন বলল,

— নমস্কার মাসিমা। আমরা আজাদহিন্দ ক্লাব থেকে আসছি। জানেন তো আজ আমাদের অনুষ্ঠান। এবারে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিমাদ্রিশেখর সেনকে সংবর্ধনা দেব। আমাদের ইচ্ছা, প্রবীণ শিক্ষয়িত্রী হিসাবে আপনি প্রশস্তিপত্রটা তাঁর হাতে তুলে দেবেন।

— না, না। আমি কেন? ও তোমরা অন্য কাউকে দিয়ে....

— না, না। মাসিমা আমরা কোনো আপত্তি শুনবো না, আপনি দেবেন, আপনি দেবেন।

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। একজন বলল,

— আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন মাসিমা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমরা আপনাকে এসে নিয়ে যাব।

ওরা হৈ হৈ করে চলে গেল।

বাণীপ্রভা ভাবছেন এতকাল পরে আবার দাঁড়াতে হবে হিমাদ্রিশেখরের সামনে। সেদিন সেই রিভলবার ভর্তি বই নিয়ে বেথুনের ছাত্রী নিবাসে ফিরে এসেছিল বাণী। সেদিন ফেরার পথে বাগবাজারের একটা ছোট আশ্রমে বাণীকে নিয়ে গিয়েছিল হিমাদ্রি। সেখানে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করল। হিমাদ্রি বলল,

— ইনি আমাদের পিসিমা, তোমারও।

হিমাদ্রির দেখাদেখি বাণীও তাঁকে প্রণাম করল। সঙ্গে আনা ফলগুলো তাঁর মাথার কাছের টেবিলে রাখল।

ফেরার সময় বাণী বলেছিল,

— গঙ্গা এখান থেকে কাছে না?

— হ্যাঁ, হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট। হিমাদ্রি বলেছিল।

বাণী বলল,

— গঙ্গা দেখতে খুব ইচ্ছা করে, গঙ্গার জল মাথায় দিতে।

— আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ছ-টার মধ্যে মধ্যে তোমাকে হস্টেলে পৌঁছতে হবে। আর একদিন আসবে?

— কবে?

— সামনের সপ্তাহে।

— সুপারকে কি বলবো?

— রবিবার এসো ছুটির দিন। গঙ্গাস্নান করে কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী সারদাদেবী থাকেন। তাঁকেও একবার দর্শন করে যেতে পারে। আর সুপারকে তাই বলবে।

পরের সপ্তাহে সুপারকে এই কথা বলাতে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন, হিন্দু বিধবার ধর্মাচরণে বাধা দেননি। সেই দিনটির কথা ভুলতে পারেনি বাণী। জীবনে প্রথম মুক্তির স্বাদ। সকালে বেরিয়েছিল সেদিন, জলখাবার খাওয়া হয়নি, হিমাদ্রি শালপাতার ঠোঙায় কচুরি আর নিরামিশ তরকারি এনেছিল। বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে বসে তাই খেয়েছিল। গঙ্গার ধার ধরে অনেক হেঁটেছিল, সেদিন অবাক হয়ে দেখেছিল গঙ্গার বুকে জাহাজের চলাচল, জেলেদের মাছ ধরা। বাণী বলল,

— অনেক হেঁটেছি, এবার একটু বসি।

গঙ্গার ধারে একটা বেদীতে বসল দু'জন, শীতের মিষ্টি রোদ গায়ে লাগছে। বাণী প্রথম কথা বলল,

— হিমুদা,

— বলো।

— আপনি বিয়ে করছেন না কেন?

— তেমন পাত্রী পাচ্ছি কই?

— কেন, পাত্রীর অভাব! আমাদের সঙ্গে পড়ে একটা মেয়ে, বাড়ি পূর্ববঙ্গে আপনাদের পাল্টি ঘর হবে। বলুন তো ঘটকালি করি।

— ওই দেখ।

গঙ্গার দিকে আঙুল তুলে দেখাল হিমাদ্রি একটা বক ছোঁ মেরে একটা মাছ তুলে নিল। মাছটা তখনও ছটফট করছে। কেউ আর কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাওয়ার পর হিমাদ্রি বলল,

— চলো স্নান করবে।

দু'জনে এসে দাঁড়াল একটা মেয়েদের ঘাটের সামনে। হিমাদ্রি বলল,

— যাও, স্নান করে এসো। এখন ভরা জোয়ার। বেশি জলে নেবো না।

— আমি গঙ্গায় ভেসে গেলেও কার কী যায় আসে বলুন?

— বাণী!

কাপড় গামছা নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল বাণী। শীতের গঙ্গার জল, কিন্তু একটুও ঠাণ্ডা নয়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল বাণী। সেখান থেকে সারদা মায়ের বাড়ি। মা অসুস্থ থাকায় দেখা হল না। হিমাদ্রি একটা মঠে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। সেই মঠে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া। তারপর আবার গঙ্গার ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিল। বিকেলে শালপাতার ঠোঙায় গরম জিলাপি খাইয়েছিল হিমাদ্রি। সেই দিনটির কথা কোনোদিন ভোলেনি বাণী। সেদিন কত কথা বলার ছিল হিমাদ্রিকে, কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। ছ'টার মধ্যে আবার হস্টেলে।

বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময় দাদা নিতে এসেছিল বাণীকে। বইপত্রের মাঝখানে সযত্নে হোমারের ইলিয়ডটি

যক্ষের ধনের মতো রেখে দিয়েছিল। বাড়ির কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে সেই ইলিয়ডের মধ্যে কী বস্তুটি আছে। ছুটির মধ্যে মাঝে মাঝে আসে হিমাদ্রি দু-একটা কথা বলে চলে যায়। ইশারায় বলে ওই জিনিসটি যথাসময়ে নিয়ে যাবে। ছুটির পর কলেজ খুললেই বাণীর আই এ পরীক্ষা, এখন পড়ার চাপ খুব। সব সময় বই নিয়ে পড়ে থাকে। কলেজ খোলার দিনকয়েক আগে হিমাদ্রি এলো। মা বললেন,

— হিমু আমাদের ভুলেই গেছে। ভুলেও এদিকে আসে না।

— কী বলছেন মাসিমা, আপনাদের ভুলতে পারি! নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, আমার সময় হয় না।

একথা সেকথার পর বাণীকে বলল,

— তোমার কাছে হোমারের ইলিয়ড বইটা আছে?

— হ্যাঁ, তবে বইটা আমার নয়, আমার এক বান্ধবীর, আমি পড়তে নিয়েছিলাম।

— পড়েছ?

— হ্যাঁ।

— কেমন লাগল?

— ভাল।

— বইটা আমাকে ক'দিনের জন্য দিতে পার? তুমি যাবার আগে ফেরত দিয়ে যাব।

— হ্যাঁ, নিন।

বাণী সযত্নে রাখা বইটা হিমাদ্রির হাতে তুলে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হলো। একদিন মা এসে কাছে বসলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

— বাণী মা'রে, বিদ্যাসাগর মশাই তো বিধবা বিবাহের নিদান দিয়েছেন। আইন পাশও তো হয়ে গেছে। তাহলে বিয়ে করতে তোর আপত্তি কোথায়? শুনেছি, ব্রাহ্মদের ঘরে এমন বিয়ে হয়। নয়তো ব্রাহ্ম ঘরে তোর বিয়ে দেব। আর একটা কথা, আমার মনে হয় হিমু তোকে মনে মনে ভালবাসে। আমি একবার বললে সে রাজি হয়ে যাবে। সে তো সংস্কার মানে না। তোর বাবা যদি না মেনে নেয় তোরা না হয় আলাদা থাকবি।

— তুমি একটু থামবে মা, আমি একটা জরুরি পড়া করছি।

মা আর কোনো কথা বলার সাহস পাননি। আই এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে বাণী। বি-এতে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরিতে যায় বাণী। রেফারেন্স বই খুঁজে খুঁজে নোট করে। তবে খবরের কাগজে একবার চোখ বুলাবেই। সেদিন একটা খবর দেখে যেন পাথর হয়ে গেল বাণীপ্রভা। 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রথম পাতায় হেড লাইন— 'গুলিতে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেড্রিক বেনসন নিহত। সন্দেহভাজন আততায়ী হিমাদ্রি শেখর সেন ধৃত।'

সহপাঠিণী কমলা জিজ্ঞাসা করল,

— কী হয়েছে রে?

— না, কিছু না।

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল বাণীপ্রভা। সারাদিন কিছু খায়নি। রাতে সুপার জিজ্ঞাসা করলেন,

— কী হয়েছে তোমার?

— শরীরটা ভালো লাগছে না।

— ডাক্তার ডাকবো?

— না, ম্যাডাম। ও আপনি সেরে যাবে।

এভাবে দিন কয়েক কাটল। একদিন সকালে সুপার বাণীপ্রভাকে ডেকে পাঠালেন নিজের অফিসে। সেখানে দু'জন অপরিচিত লোক। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সুপার বললেন,

— উনারা তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। ওই চেয়ারে বসো।

বাণীপ্রভা অপরিচিতি ভদ্রলোক দুজনের মুখোমুখি বসল। একজন জিজ্ঞাসা করল,

— আপনার নাম?

— বাণীপ্রভা ভট্টাচার্য

তারপর একে একে বাবার নাম, ঠিকানা, এ-প্রশ্ন সে-প্রশ্নের পর একজন জিজ্ঞাসা করল,

— আপনি, হিমাদ্রিশেখর বসুকে চেনেন?

— হ্যাঁ, চিনি।

— কীভাবে চেনেন?

— আমাদের একই গ্রামে বাড়ি। আর উনি আমার দাদার সহপাঠী।

— আপনার কলেজের রেজিস্টারে দেখছি লোকাল গার্জেন হিসাবে ওনার নাম।

— হ্যাঁ, কলকাতায় আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, উনি কাছেই হাতিবাগানের মেসে থাকতেন বলে বাবা ওনাকে লোকাল গার্জেন হতে বলেছিলেন।

— আচ্ছা, আপনি ওনার সঙ্গে কখনো বেরিয়েছেন আপনার হস্টেল থেকে?

— হ্যাঁ, দুদিন বেরিয়েছি।

— কোথায় গিয়েছিলেন?

— একদিন আমার এক অসুস্থ পিসিমাকে দেখতে। আর একদিন গঙ্গাস্নান করতে।

— আপনি এই মাত্র বলেছেন আপনার কোনো আত্মীয়-স্বজন কলকাতায় থাকেন না।

— উনি বাবার দূর সম্পর্কের দিদি, বৃদ্ধা। বাগবাজারের একটা আশ্রমে থাকতেন।

— এখন থাকেন না?

— মাস কয়েক আগে উনি মারা গেছেন।

— আচ্ছা, হিমাদ্রিবাবু আপনাকে কী কী জিনিস রাখতে দিয়েছিলেন?

— উনি আমাকে কোনোদিন কোনো

জিনিস রাখতে দেননি।

— ভেবে দেখুন, একটি বিশেষ জিনিস উনি একসময় আপনাকে রাখতে দিয়েছিলেন।

— না, উনি আমাকে কোনো জিনিস রাখতে দেননি।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার পর ওরা চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, প্রয়োজনে তার সঙ্গে ওরা আবার কথা বলবে। ওরা আর আসেনি। কারণ, শত নির্যাতনেও হিমাদ্রি বাণীর নাম বলেনি। দীর্ঘ বিচারের পর হিমাদ্রি সেনের শাস্তি হয়ে গেল দীপান্তর। রতনপুরে সেদিন অরন্ধন, রতনপুরবাসী শোকস্তব্ধ। কয়েকদিনের মধ্যে খিদিরপুর ডক থেকে আন্দামানে চালান হয়ে গেল হিমাদ্রি সেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্টে দুর্দান্ত খুনি বিপ্লবী। ক'দিন পরেই বাণীর বি এ পরীক্ষা। চোখের জল মুছে পড়াশুনায় মন দিল বাণী। দিনরাত এক করে পড়া। প্রথম শ্রেণীতে পাশ করল বাণী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মিশনারি স্কুলে চাকরি পেল। আবার কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে সরকারি স্কুলের চাকরি। নানা জায়গায় বদলি হয়েছে। মা বাণীর আবার বিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন। বাবারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাণী কিছুতেই রাজি হয়নি। ইতিমধ্যে বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছেন। দাদা সরকারি চাকরি করে, সংসারি হয়েছে। পূজার ছুটিতে রতনপুরে আসে বাণী। দাদার এক ছেলে এক মেয়ে। ওরা পিসিকে ভীষণ ভালবাসে। হিমাদ্রি সেনের আর কোনো খোঁজ পায়নি বাণী। এল ১৯৪৭ সাল। দেশ ভাগ হলো। বাণী তখন পূর্ববঙ্গে কুমিল্লা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। বদলি নিয়ে এলো ভারতে। চাকরি হল হুগলীতে। হিমাদ্রির খবর পাওয়া গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রতনপুরে ফিরে এসেছে। পাকিস্তানেই থেকে যাবে, ভারতে আসবে না। বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল একবার দেখা করতে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। হিমাদ্রিও বাণীর খোঁজ আর করেনি। গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বাণীপ্রভা। দীক্ষা নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন থেকে। মগরায় গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়ি করেছেন। একজন স্বামী পরিত্যক্তা বানবাসী মেয়ে সবসময় থাকে। সৎ, সাহসী মেয়ে চামেলি। বাণীপ্রভাকে মা বলে ডাকে। আবার মায়ের মতো খবরদারিও করে। তার খবরদারিতে স্নান, খাওয়া, ঘুম, ওষুধ খাওয়া সব যথাসময়ে করতে হয় বাণীপ্রভাকে। এতটুকু অনিয়মের সুযোগ নেই। দুজনেরই আজ কাছের মানুষ বলতে কেউ নেই।

— মা, তুই সেই সকাল থেকে কি ভাবছিস বটে বলতো? চান-খাওয়া করবিনেকো?

চামেলির ডাকে আবার সম্বিত ফেরে বাণীপ্রভার। চামেলি বাজার করতে বাইরে গিয়েছিল। তাই এতটা সময় পেয়েছেন বাণীপ্রভা। নয়তো এতক্ষণে স্নান খাওয়া করে নিতে হতো।

— দেখ্ গরম জল করে রেখে দিয়ে গেছি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

— থাক্ চামেলি, আজ গরম জল লাগবে না, ঠাণ্ডা জলেই স্নান করে নেব।

— হুঁ, ঠাণ্ডা জলে চান করবে। কোমর ব্যথা হলে কে দেখবে? যা যা তুই চান ঘরে যা। আমি আবার গরম জল করে দিয়েছি।

স্নান খাওয়া শেষ করতে করতে ক্লাবের ছেলেরা গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। বলল—

— মাসিমা, তৈরি হয়ে নিন। আমাদের চিফ গেস্ট কাছাকাছি এসে গেছেন।

— এতটুকু রাস্তা ও আমি চামেলিকে নিয়ে হেঁটেই চলে যাব।

— তা হবে না মাসিমা। পাড়ার হলেও আজকে আপনি আমাদের ক্লাবের গেস্ট। একটা ছেলে বলল। শেষপর্যন্ত ওদের গাড়িতে যেতে হলো। সুন্দর মঞ্চ তৈরি করেছে। বাণীপ্রভাকে ক্লাবের একটা ঘরে নিয়ে বসানো হলো। মিনিট পনেরোর মধ্যে এসে পৌঁছলেন প্রধান অতিথি বিপ্লবী হিমাদ্রি শেখর সেন। সেই ঘরেই বসানো হলো তাঁকে। সবাই উঠে দাঁড়াল। আগে থাকতে জানা না থাকলে বাণীপ্রভা চিনতে পারতেন না তাঁর হিমুদাকে। মাথার চুল কমে এসেছে, যেকটা আছে তাও ধবধবে সাদা। একটু মোটাও হয়েছেন। গায়ের রঙটাও আগের থেকে অনেকটা ফর্সা। হিমাদ্রি শেখর সেন কি চিনতে পেরেছেন বাণীপ্রভাকে? চেনার কথাও নয়, কত যুগ পরে দেখছেন। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। মঞ্চে ডেকে নেওয়া হলো প্রধান অতিথি আর অন্যান্য অতিথিদের। এবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সঞ্চালক ঘোষণা করলেন—

— এবার আমরা সংবর্ধিত করবো অগ্নিযুগের সেই বরেণ্য বিপ্লবীকে। দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের অপরাধে জীবনের অনেকটা বছর যাঁকে কাটাতে হয়েছিল দীপান্তরের কারান্তরালে। এই মহান বিপ্লবীকে সংবর্ধিত করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা বাণীপ্রভা ভট্টাচার্য।

প্রশস্তিপত্র হিমাদ্রিশেখরের হাতে তুলে দিলেন বাণীপ্রভা। প্রশস্তিপত্র হাতে নিয়ে হিমাদ্রিশেখর বললেন,

আমাকে এই সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ এই আজাদ হিন্দ ক্লাবের সদস্যদের কাছে। স্বাধীন ভারতে সম্মান সংবর্ধনা অনেক পেয়েছি, কিন্তু আজকের এই সংবর্ধনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যাঁর হাত দিয়ে আজ এই সংবর্ধনা আমাকে দেওয়া হলো তিনি সম্মানীয়া

একজন শিক্ষয়িত্রী ছাড়াও তাঁর আর একটা বিশেষ পরিচয় আছে, যা সমস্ত দেশবাসীর অজ্ঞাত।

পিন পড়লে শোনা যায় এমন স্তব্ধতা সভাস্থলে। হিমাদ্রিশেখর বলে চলেছেন,

— ঢাকার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেড্রিক বেনসনকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে আমার দীপান্তর হয়েছিল। যে রিভলবারের গুলিতে ফ্রেড্রিক নিহত হয়েছিলেন সেই রিভলবারটি কলকাতা থেকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী রতনপুরে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই দিদিমণি— বাণীপ্রভা ভট্টাচার্য।

মুহূর্তে করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সভাস্থল। আবার কথা বলেন হিমাদ্রিশেখর,

— আমার মুখ থেকে বাণীপ্রভার নাম বের করার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল, কিন্তু আমি বাণীপ্রভার নাম বলিনি।

হঠাৎ করে ডুকরে কেঁদে ওঠে বাণীপ্রভা। হিমাদ্রিশেখর তাঁর মাথায় হাত রাখে। উদ্যোক্তা এবং উপস্থিত দর্শকরা কল্পনাও করতে পারেনি এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী তারা হতে পারবেন।

হর্ষ উল্লাসের মধ্যে সভার কাজ শেষ হলো। বাণীপ্রভা বললেন,

— কাছেই আমার বাড়ি, একবার চলুন।

ক্লাব কর্তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বাণীপ্রভার বাড়িতে গেলেন দু'জনে। চামেলি বারান্দায় দুটো চেয়ার পেতে চা দিয়ে গেল। বাণীপ্রভা বললেন,

— বিয়ে করেছেন তো?

— না।

— কেন?

— সেই সুযোগ আর পেলাম কই?

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। হিমাদ্রিশেখর বলেন,

— আন্দামান থেকে দেশে ফিরে তোমার অনেক খোঁজ করেছি। শুনলাম তুমি কলকাতায় চলে এসেছ। আমিও ছিলাম পাকিস্তানে কয়েক বছর। ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। পাকিস্তান সরকার নানাভাবে হেনস্থা করতে লাগল। দেশ ছেড়ে একদিন চলে এলাম। একটা চাকরিও পেয়েছিলাম। এখন রিটায়ার্ড। কলকাতায় একটা ছোট বাড়ি আছে, একা থাকি। এসো না একবার। কত কথা জমা হয়ে আছে।

— আজ থেকে যান না।

— তোমার অসুবিধা হবে না?

— না, কীসের অসুবিধা?

চামেলি এসে বলল,

— ভীষণ মেঘ করেছে মা। এক্ষুনি ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। তুমি আজ যেতে পারবেনিকো বাবু। থেইকে যাও।

হিমাদ্রিশেখর বলল,

— কী খাওয়াবে রাত্রে?

— খিচুড়ি বসিয়ে দিচ্ছি। গরম গরম খাবে।

— ঝড় বৃষ্টি শুরু হল বলে। বাবুরে যেতে দিওনিকো মা। আমি রান্না চাপালাম।

চামেলি রান্নাঘরে ঢুকল। ঠিক তখনই শুরু হল বৃষ্টি, মুষলধারে। জলের ঝাপটা লাগছে দুজনের গায়ে।

■

JINDAL MECTEC PVT. LTD.

Corporate office

Old Manesar Road, Narsingpur, Near Hero Honda Chowk
Behind Bestech Cyber Park Building, Gurgaon - 122001
Haryana, (INDIA).
Tel. +91-124-4086401/ 4393200, Telefax : +91-124 4030807
e-mail : jindalmectec@jindalbrothers.in

Regd. Office

B29 Sanjay Market, Pocket III, Sec. 2, Rohini,
Delhi- 110 085.
Tel. +91.11.27512283, Telefax : +91.11.27514043

Manesar

Plot No. 91, Sec. 8, IMT Manesar,
Gurgaon - 122050
Haryana (INDIA).

Nalagarh

Village Souri, Nalagarh Swarghat Road, Tehsil Nalagarh,
Dist. Solan - 174101 (H.P.)
Tel. +91-1795-220819/ 820, Fax - + 91-1795-220818
www.jindalmectec.com

ভারতবন্ধু বিদেশিরা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের ভারতবর্ষে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বহমান হচ্ছে একটি ধারা। আমরা কথায়বার্তায় শুভ বা মঙ্গলময় কোনো কিছু নির্দেশ করতে যেমন বলি 'রাম রাজত্বে' এমনটা হয়। তেমনি একটি বাস্তব অনুভূতি উপলব্ধি করেছেন দীর্ঘদিনের ভারততত্ত্ববিদ ডেভিড ফ্রলে। তিনি লিখছেন, 'A new Rama Rajya is arising slowly, but steadily in India today. Dharma in once more being brought into Social & Cultural discourse'। পদ্মভূষণ প্রাপক এই পর্যবেক্ষণের লেখক নিজেকে পণ্ডিত বামদেব শাস্ত্রী হিসেবেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিনি আমেরিকার সান্টা ক্রো অঞ্চলে (নিউ মেক্সিকো) ভারতীয় যোগ, যৌগিক জ্যোতিষচর্চা, বেদান্তচর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। বিশ্ববাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন শতাধিকবর্ষ আগে। স্বাধীনোত্তর ভারতে আমাদের দেশের শাসককুল সদা এক বিজাতীয় ভাবনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দেশ পরিচালনা করে এসেছে। দেশের অন্তঃস্থলের মৌলিক ধর্মীয় চেতনাগুলিকে বিগত সাত দশকের রাষ্ট্র পরিচালনার কালখণ্ডে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বিযুক্ত করার চেষ্টায় নিরত থেকেছে। সাফল্যও হাতেনাতে দেখা গেছে। আমেরিকা সরকারের নতুন ভিসা সংক্রান্ত অভিবাসন নীতি নিয়ে সে দেশের সরকারের থেকে এদেশের সদ্য কলেজ

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

ডেভিড হেয়ার

অ্যানি বেসান্ত

উত্তীর্ণরা খুবই মুষড়ে পড়েছে। দেশের ভিসা নীতি প্রণয়ন করা একান্ত সেই দেশটির ইচ্ছাধীন। প্রতিযোগিতায় যাকে সেদেশের প্রয়োজন হবে যোগ্যতার মানদণ্ডে সেই সেখানে পৌঁছবে। কিন্তু বাজারে চালু করে দেওয়া তথাকথিত 'আমেরিকান ড্রিম'-এর দৌলতে কলেজ ছাড়লেই চল বিদেশে। ৫০-এর দশকের গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, থিয়েটারে আকছার দেখা যেত বিলেত না গেলে ঠিক সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় না। উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সাধ্য, সঙ্গতি, যোগ্যতা থাকলে তা কোনো অন্যায় তো নয়। কিন্তু তাঁরা শিক্ষান্তে এক আধটা ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই স্বদেশে ফিরে আসতেন। দেশের কাজে লাগতেন। আজ অভিভাবকদের বাৎসল্যও কেমন যেন Expiry date চিহ্নিত হয়ে গেছে। ২২ বছরের পর তামাদি হয়ে যাবে। পুত্র-কন্যারা ভিনদেশী স্বপ্ন নিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দেবে।

ফ্রলে বা অযোধ্যায় রামমন্দিরের অস্তিত্ব নিয়ে পরিশ্রমী গবেষক Koenraad Elst-এর মতো ভারততত্ত্ববিদরা এই পরিস্থিতিরই বিপক্ষে বলছেন। যেহেতু তাঁরা ভারতীয় নন, তাই এক ধাক্কায় তাঁদের সাম্প্রদায়িক তকমাধারী করে দেওয়া একটু শক্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শাসনাধীন ঔপনিবেশিক ভারতে এর বিপরীত স্রোত কিন্তু দেখা গেছে। স্বদেশ ছেড়ে বহু ইংরেজ ভারতে চাকরি বা ব্যবসা করতে এলেও

অনেকে এই ভারতাত্মার অমোঘ আকর্ষণে এখানে স্থিতু হয়েছেন। এই দেশের শুভ কামনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এমনি কয়েকজনের পুণ্য জীবনকথা আলোচনা করা যাবে। যা বহু আলোচিত হলেও প্রতি প্রভাতের সূর্যালোকের মতো কখনোই পুরনো হয় না।

ইংরেজ শাসন শুরুর দিকে ১৮০০ সালেই স্কটল্যান্ড থেকে এসেছিলেন ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)। সেই সময় ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও জ্ঞানভাণ্ডার প্রায় অপ্রচলিত। মুঘল আমল শেষে কিছু কিছু সংস্কৃত চতুষ্পাঠী চালু আছে মাত্র। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে পাওয়া যায়, 'Hindu religion was denounced as vile & corrupt & unworthy of the regard of rational being. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates'।

নিজের পূর্বপুরুষদের অর্জিত বিদ্যা পরিত্যক্ত, বিদেশের অগ্রসরমান শিক্ষার আলো থেকেও জাতি বঞ্চিত। হেয়ার কিন্তু অন্যান্য মিশনারিদের মতো স্বধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে ভারতে আসেননি। অত্যন্ত কোমল হৃদয় মানুষটি বর্তমান লালবাজারের কাছে একটি ঘড়ির দোকান চালাতেন। দেখা হয়ে গিয়েছিল রাজা রামমোহনের সঙ্গে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে।

সাহেবিয়ানা আত্মস্থ করতে কোনো কোনো অতি উৎসাহীর কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হেয়ার অদম্য উৎসাহে রামমোহনের সহায়তায় বিদ্যালয় পাঠ্যসূচি নির্ধারণের জন্য প্রথম School Board Society স্থাপন করলেন। কলকাতার নানা ইংরেজি ও সঙ্গে বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে অচিরাৎ তাঁর জীবিকা ঘড়ির দোকান বিক্রি করে দেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি) প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান কম নয়। হেয়ার আর স্কটল্যান্ডে ফিরে যাননি। কলকাতায় কলেরা আক্রান্ত একটি বালকের শুশ্রূষা করাকালীন তিনি নিজেও এই মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৮৪২ সালে তিরোহিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, 'তিনি ক্রিষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া ক্রিষ্টীয় সমাজক্ষেত্রে তাঁর সমাধি লাভ করা কঠিন হইল। অবশেষে তাঁহারই প্রদত্ত ও হিন্দু কলেজের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তাঁহাকে সমাহিত করা হইল।' ইত্যবসরে দেশবাসী তো তাঁকে মহামতি, মহাত্মা অভিধা দিয়েই বসেছিল। হেয়ার এদেশকে অশ্রদ্ধা তো নয়ই গভীরভাবে ভাল বেসেছিলেন।

ডেভিড হেয়ারের মতোই আর এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রমণী অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) স্বদেশভূমির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের ভূমিকা স্মরণীয় করে গেছেন। বেসান্ত একজন সৃষ্টিধর্মী লেখিকা হওয়ার পাশাপাশি অতি সুবক্তা ছিলেন। তাঁর ভাষণ থাকত জলদগম্ভীর। এত তীব্রস্বরে বক্তৃতা করতেন যে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন, অ্যানি ভারতীয়দের গভীর সুপ্তি থেকে জাগ্রত করে তুলেছেন। ১৯১৬ সালে লোকমান্য তিলকের সঙ্গে একত্রে 'হোম রুল লিগ'-এর পত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৭ সালে তিনি ১ বছরের জন্য প্রথম মহিলা কংগ্রেস সভাপতিও হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে তিনি নিরলস লেখালিখি করে গেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী অ্যানি বিশ্বাস করতেন এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে। ১৮৯৩ সালে তিনি ভারতকে নিজের দেশ বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনা ভারতের অন্তর্নিহিত অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষ্যবাহী। প্রথম জীবনে কিছুটা মার্ক্সীয় মতবাদে ঝুঁকলেও তিনি ছিলেন প্রবল ধর্মবিশ্বাসী। ১৯০৮ সালে 'Theosophical Society'-এর সভাপতি হওয়ার পর তিনি অজস্র বক্তৃতায় দেশবাসীকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি দুর্বলতা ছেড়ে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধির কথা বোঝাতেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উক্তি ছিল 'India is a country in which every great religion finds a home'। আজকের চেন্নাইয়ে ১৯৩৩ সালে যেখানে তিনি মারা যান সেই অঞ্চল তাঁর স্মৃতিতে 'বেসান্তনগর' নামে পরিচিত।

লক্ষ্য করার বিষয়, অ্যানি বেসান্ত যেমন ভারতে আসার পর নাস্তিক্যবাদী Fabian Society-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে Theosophical Society প্রতিষ্ঠা করার মতো চরম আস্তিক্যবাদী কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তেমনি সময় বরাবর ১৯০৪ সালে খোদ Church of England-এর পাদ্রী C F Andrews আজকের ঐতিহ্যপূর্ণ ও তৎকালীন ইয়োরোপীয়দের নিজস্ব St. Stephen College-এ দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেও হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাড়তেই থাকে।

ভারতের মানুষের ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বরাবর মর্যাদা দিতেন। সরকারের উচ্চ-পদাধিকারীদের দরবারে তিনি ভারতবাসীর অসন্তোষের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতেন। তাঁর এই ভারতপ্রীতি দেখে তাঁর নামের ইংরেজিতে যাকে বলে initial অর্থাৎ CFA-এর পুরো ফর্ম Christ's faithful apostle বলে আখ্যা দিয়েছিলেন স্বয়ং গান্ধী। আর স্টিফেন কলেজের ছাত্ররা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ডাকত Friend of the poor বলে যা বাংলায় 'দীনবন্ধু' এন্ড্রুজ হয়েছে। এই নামেই তাঁর স্মৃতিবাহী কলকাতায় দুটি কলেজ রয়েছে। এন্ড্রুজ দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে। ক্রীস্ট ও হিন্দু ধর্মের সাযুজ্য অন্বেষণ করেছেন বরাবর। ভারতীয় শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে দু-দুবার সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন ১৯২৫, ১৯২৭ সালে। আজকের দলিত

ভোটের অংশ ভাগ নিয়ে তীব্র টানাপোড়েন নজরে পড়ে। এন্ড্রুজ সেই ১৯৩৩ সালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে দলিতদের অধিকার নির্ধারণের সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। বিখ্যাত পাদ্রী পরিবারের সন্তান ও কর্মরত পাদ্রী হিসেবে এসেও বিস্মৃত হয়েছেন তাঁর ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের কথা। এটিই ভারতীয় সনাতন ধর্মের অন্তর্লীন ঐশ্বর্য। ধর্মবিশ্বাস কোনো বাধা নয়— যে কেউ এক দেহে হল লীন-এর যোগ্য।

জিম করবেট

রুস্কিন বণ্ড

ডালারিম্পল

গান্ধীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শুধু নয়, তিনি কতিপয় কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন যাঁরা তাঁকে মোহন বলে সম্বোধন করতে পারতেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করতে গান্ধীর দেশবাসীকে সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার আহ্বানের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'তোমার এই সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আবেদন তোমারই প্রচারিত অহিংসা তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। এটি দ্বিচারিতা।' জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ভারতে কাটিয়ে ১৯৩৫ সালে স্বদেশে ফিরলেও ভাগ্যচক্রে ভারত তাকে ছাড়েনি। ১৯৪০ সালে এদেশে এসে কর্মভূমি বাঙলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে সমাধিস্থ আছেন এই ভারতপ্রেমিক।

আমরা দেখেছি, ঘড়ির দোকান বিক্রির পুঁজি নিয়ে ভারতে ছাত্রদের পড়াশোনা শুরু করাতে কী প্রাণপাত করে গেছেন মহামতি ডেভিড হেয়ার। তিনি খুব সম্পদশালী পরিবার থেকে না এলেও জন এলিয়ট ড্রিংক ওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) কিন্তু ছিলেন ব্যারিস্টার। ১৮৪৮ সালে বিলেত থেকে গভর্নর বাহাদুরের ল' কাউন্সিল-এর সম্ভ্রান্ত সদস্য হিসেবে ভারতে আসেন। জানতেন গ্রিক, লাটিন, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান-এর মতো পাঁচ পাঁচটি ভাষা। মাইকেল মধুসূদনের অমরত্ব অভিলাষী Captive Lady তখন সদ্য প্রকাশ পেয়েছে। বেথুন ভেবেচিন্তে বলেছিলেন, 'আপনার প্রতিভার স্ফূরণ কিন্তু মাতৃভাষাতেই নিহিত। বিদেশী ভাষায় সে চেষ্টা সময়ের অপব্যয় মাত্র। বেথুনের কথা মধু কবির জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছিল। বেথুন নামটি শুনলেই যেন বেথুন স্কুল, কলেজ জড়িয়ে থাকে অবিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গের মতো, তাই চটজলদি কোনো মহিলার নামই মনে আসে। এ প্রসঙ্গে Drink Water Eliot Bethune-এর গল্পটিও সুন্দর। বেথুন ছিলেন অসম্ভব মাতৃভক্ত। তাই বেথুনের মা সেই তখনকার রক্ষণশীল ইংল্যান্ডে ছেলেকে বলেছিলেন, তুই আমার পদবিটা নামের পাশে লেখ। সেই থেকেই John Eliot Drinkwater Bethune হয়ে গেলেন। বেথুনের মা তাঁকে বরাবর ভারতের মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর কথা বলতেন। কেননা, বেথুনের কলকাতা আসার আগে পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন কোনো উদ্যোগই নেয়নি। যদিও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কিছু কিছু ছিল। তিনি প্রয়োজনে বাঙলা বা ইংরেজি যে কোনো মাধ্যমেই শিক্ষা নেওয়ার বিকল্প রেখেছিলেন। আশ্চর্যের কথা, অত উচ্চ রাজকর্মচারী হলেও বেথুন আপন ঔদার্যে ও নারীজাতির প্রতি এক অলিখিত দায়বদ্ধতায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির যাবতীয় খরচ নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরুর দিন বেথুন ঘোষণা করেছিলেন, 'আর আমরা পেছন ফিরে তাকাবো না।' তাই হয়েছিল, ১৮৭৯ সালে এই স্কুল এশিয়ার প্রথম মহিলা কলেজে রূপান্তরিত হয় যা এক অসামান্য কীর্তি। কেননা, সেই সময় হিন্দু রক্ষণশীল পরিবার নারী শিক্ষায় যে তাদের মঙ্গল হতে পারে এটা তাঁরা মানতেন না। বেথুন সেই অসাধ্য সাধন করে গেছেন। স্কুল ও কলেজ উভয়ের সুনামের মধ্যেই এই শিক্ষাব্রতী ভারতসুহৃদ চিরজীবী হয়ে থাকবেন। এই কলকাতাতেই ১৮৫২ সালে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। বাঙলার রেনেসাঁ পর্ব তখন মধ্যগগনে, ড্রিংক ওয়াটার বেথুন তাতে স্থান করে নিলেন।

শিক্ষা বিস্তার, জাতীয় জীবনে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারত শুভাকাঙ্ক্ষীদের কর্মকাণ্ডের খণ্ডাংশ পরিসরে এলেও একটি পদানত জাতির জীবন থাকত আরও অসংখ্য সমস্যাসঙ্কুল। আজকে যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, সকলের আয়ত্তের মধ্যে বাসগৃহ, খোলা আকাশের নীচে শৌচকর্ম বন্ধে বিপুল উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে, এসব ১০০ বছর আগের উপনিবেশিক

ভারতে ছিল চিন্তার অতীত। উত্তর ভারতের বিস্তৃর্ণ গ্রামাঞ্চল, প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলি যেখানে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালার গাড়ওয়াল, কুমায়ূন রেঞ্জের অংশ, তা ছিল শ্বাপদসঙ্কুল। নিরীহ গ্রামবাসীর নিত্যদিন প্রাণ যেত বাঘ-চিতার আক্রমণে। এখানে পরিত্রাতা হয়ে এসেছিলেন বিশ্বখ্যাত জিম করবেট। তাঁর জন্ম হয়েছিল নৈনিতালে (১৮৭৫-১৯৫৫)। ছোটবেলা থেকেই জীবন কাটিয়েছেন হিমালয়ের কোলে। বাবা মিলিটারি কর্নেলের চাকরি ছেড়ে নৈনিতালের পোস্টমাস্টার হয়ে যান। এখানেই বড় হয়েছেন করবেট। কান পেতে শুনছেন বন্য প্রাণীর ডাক। জঙ্গলে জঙ্গলে অনুসরণ করেছেন মানুষখেকোদের।

আজকে কান্ডী চেপে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী কেদারনাথ দর্শনে যাচ্ছেন। প্রায় ১০০ বছর আগে পুণ্যার্জনের পথ ছিলে ব্যাঘ্র কবলিত। ১৯২৬ সালে কেদার-বদ্রীর পথে ইতিমধ্যেই প্রাণ গেছে ১২৬ জন তীর্থযাত্রীর। রেলওয়ে কনট্রাক্টরের কাজ করলেও করবেট ছিলেন জঙ্গলেরই মানুষ। তাঁর বন্দুকের গুলি এড়ানো ছিল ধূর্ত মানুষভুকদের পক্ষেও কঠিন। প্রায়ই ডাক পড়ত তাঁর। তবে প্রমাণিত মানুষ-মারা জানোয়ার না হলে করবেট কদাচ শিকার করতেন না। তাঁর রচনা থেকে জানা যায়, তিনি এমন সব বাঘ বা চিতা শিকার করে দরিদ্র অসহায় পাহাড়বাসীর জীবন বাঁচিয়েছিলেন, যারা অনেকে একত্রে ১২০০ জন মানুষ বা চিতা বাহিনী ৪৫০ জন মানুষ হজম করেছিল। নৈনিতাল, গাড়ওয়ালের মানুষের কাছে তাঁর আসন ছিল ঈশ্বরের। রেলের কনট্রাক্টর হওয়ার সুবাদে কর্মস্থল মোকামা ঘাটে হাজার হাজার গরিব বিহারি মজদুরকে চাকরি দিয়েছিলেন। এত শিকার করলেও তা তিনি করেছিলেন সখে নয়, মানুষের জীবন বাঁচাতে। আসলে কিন্তু ভালোবসতেন বন্য প্রাণী, অরণ্যের সংরক্ষণ। কুমায়ূনের পাহাড়ে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন Hailey National Park যা ১৯৫৭ সাল থেকে করবেট পার্ক নামে বিখ্যাত। জীবন-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন সুললিত ভাষায়, 'Maneaters of Kumaun, Leopard of Rudraprayag, Jungle Lore প্রভৃতি গ্রন্থে। বইগুলি সারা বিশ্বে সমাদৃত। কুমায়ূন অঞ্চলে জন্ম নেওয়া এই বীর ভারতহিতৈষী তাঁর বইয়ের ভূমিকায় নিজেকে উন্মোচন করেছেন চমৎকারভাবে— 'It is of these people, who are admittedly poor, and who are often described as India's starving million among whom I have lived & whom I love, that I shall endeavor to tell in the pages of this book, which I humbly dedicate to my friends, the poor of India'। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে ভোলেনি। হাওড়া থেকে নৈনিতাল (তাঁর জন্মস্থান) অবধি চলা ট্রেনটির গা ছমছমে নাম 'জিম করবেট এক্সপ্রেস'।

নিজ গৌরবে অমরত্ব অর্জনকারী কয়েকজন প্রয়াত অসামান্য ভারতবন্ধু বিদেশীর ঋণ স্বীকারের পর এমন কয়েকজন যাঁরা পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতভূমির সম্মোহনে এখানেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তাদের কথা আলোচনা করা যাক।

জিম করবেট যেমন কুমায়ূন পর্বতমালা অঞ্চলে বড় হয়েছিলেন তেমন আরও একজন ইংরেজ সন্তান রাসকিন বন্ড হিমালয়ের আকর্ষণে রয়ে গেছেন দেহরাদুন মৌসুরীর সীমানায়। ৮৩ বছরের প্রবীণ এই মানুষটি একেবারে প্রথম যৌবনেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের তরুণ লেখক পুরস্কার জিতেছিলেন। ফিরেও গিয়েছিলেন স্বদেশে, কিন্তু তাঁর জন্মভূমি ভারতকে ভুলতে পারেননি। কয়েক বছর নানা পেশায় কাটিয়ে লেখক হওয়ার বাসনা নিয়ে ফিরে আসেন ভারতে। বন্ডের জীবনযাত্রায় পুরনো ব্রিটিশ যুগের বাংলোবাড়ি, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, জনবিরলতার প্রভাব থাকলেও তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আদ্যন্ত ভারতীয় জীবনযাত্রা। বিশেষ করে তাঁর মুন্সীয়ানা শিশুসাহিত্যে। আজ বলতে দ্বিধা নেই, ভারতের কয়েক কোটি ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে। বন্ডের কৃতিত্ব তাঁর নির্মল ছোট গল্পগুলি যেখানে ভারতীয় পাহাড়তলীর মানুষের জীবনযাপনের কথা আশ্চর্য মমতায় ফুটে ওঠে, তার অধিকাংশই বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ আমলের পরেও যেমন ইংরেজ জীবনের গল্প পাঠ্যাংশ ছিল, এখন ইংরেজি শিখতে ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় জীবনশৈলী শিশুদের মনোগ্রাহী করে তোলার কৃতিত্বের দাবিদার রাসকিন বন্ড। উত্তরাখন্ডের পাহাড়, নদী, অরণ্যানীর অশ্রুত সঙ্গীত বন্ডের লেখনীতে বিশ্বের নানা দেশে শ্রুত হয়। পেঙ্গুইন আন্তর্জাতিক প্রকাশক হিসেবে নিয়মিত তাঁর বই ছাপে। ইতিমধ্যে পেয়েছেন দেশীয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও পদ্মভূষণ সম্মান। পরবর্তী প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর পর্যবেক্ষণের একটু নমুনা এরকম— 'আমার মনে হয় হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম যা প্রাকৃতিক ধর্মের সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পারে। নদী, পর্বত, বনানী, ছোট গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি সকলেই জগতে তাদের কাজ করে যায়। আমরা পুরাণের কথাই বলি বা প্রতিদিনের পূজা-অর্চনা— অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই যোগসূত্র ও সমন্বয় এই হিমালয়ের পাদদেশে থাকলেই সবচেয়ে ভাল উপলব্ধি করা যায়। আমি প্রার্থনা করি, শহরীকরণের দুর্বার গতি যেন এই অসামান্যতাকে বিনষ্ট না করে দেয় (Ruskin Bond - Rain in the mountains, Notes from the Himalays - অনুবাদ : লেখক)।

অকৃতদার রাসকিনের হিমালয় বন্দনা অপ্রতিহত থাকুক। ভারতকথা তিনি আরও দীর্ঘায়ু হয়ে তাঁর লেখনীতে বিতরণ করুন। রাসকিন বন্ড পাহাড়ি নির্জনতায় ভারতীয় জীবন অন্বেষণে মগ্ন

থাকলেও আর এক বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ যিনি জন্মসূত্রে স্কটিশ, সেই উইলিয়াম ডেলারিম্পল (১৯৬৫) কিন্তু বিপুল উদ্যমে সমগ্র ভারতভূমি পর্যটন করে বেড়াচ্ছেন। জয়পুরে যে বাৎসরিক (Literary Festival) আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব হয়, তার তিনি অন্যতম আয়োজক। স্মরণে থাকবে, কয়েক বছর আগে বুকারজয়ী সলমন রুশদির এই সভায় যোগদান তথাকথিত সংখ্যালঘু শ্রেণীর দুর্বৃত্তরা আটকে দেয়। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ডেলারিম্পলের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখালিখি আমেরিকা ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। উল্লেখিত, সাহিত্য উৎসবে ইংরেজিতে ভারতীয় জীবনসম্পৃক্ত লেখালিখিতে অরবিন্দ আদিগা, চেতন ভগত, রেহিন্টন মিস্ত্রী, ঝুম্পা লাহিড়ীরা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কথা বিদেশে পৌঁছে দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে বহু পুরস্কারে সম্মানিত কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের এই প্রাক্তনী ১৯৮৯ থেকে অধিকাংশ সময় ভারতেই থাকেন। দিল্লির মেহেরলীর ঐ আস্তানাটি একেবারেই তাঁবু সমেত ভারতীয় রীতির জীবনযাত্রার অনুসারী। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর দাপটে ভারতে হিন্দুধর্মের কথা বলাটা প্রায় অস্পৃশ্যতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তাঁর 'Nine Lives : In search of the sacred in Modern India' আধুনিক ভারতের পবিত্রতম বস্তুগুলির সন্ধানে ৯টি মানুষ। বিচিত্র এই গ্রন্থের পাত্রপাত্রীরা ভারতের চির-বিচিত্র সমাজের প্রতিভূ, যারা নিজেরে কথা নিজেদের কণ্ঠেই তুলে ধরেছে। সেই অভিযাত্রায় হিন্দু ব্রাহ্মণ থেকে বিহারি মুসলিম, জৈন, থেকে সুফী হয়ে বৌদ্ধধর্মী কেউই বাদ পড়েনি। এই বহুধর্মীয় চরিত্র সমন্বয়ে পরীক্ষামূলক বইটির লিখন পর্বের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — 'Westerners have been misinterpreting Indian Religion for so long & the number of traps you can fall into.... westerners in this country writing about religion is guilty of all charges exoticsm, orientalism or a hippy going around ashrams...।

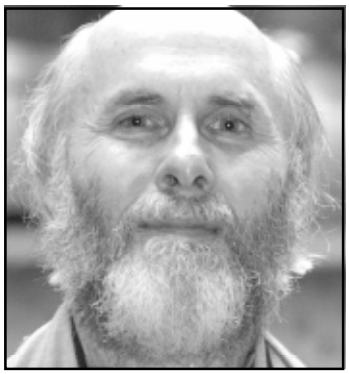

ডেভিড ফ্রলে

সি এফ অ্যান্ড্রুজ

রীতা সিংহ

সাপ, সাধু, ওঝার ভারত আজ অতীত, সেটাও ছিল আংশিক অপপ্রচারদুষ্ট, কেননা ভারতের বেদ উপনিষদ ও পুরাণগুলির মনীষা কোনোদিনই কলুষিত করতে পারেনি কেউ। বিদেশের বহু শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞজন অজস্রবার তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁদের তালিকাও দীর্ঘ। সেই সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সর্বকালীন যুগান্তকারী বুদ্ধিজীবী ভল্টটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) যিনি তথাকথিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত সম্পর্কে সেই তিনশো বছর আগে বলেছিলেন, 'আজ সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজন ভারতকে। ভারতের কাউকেই প্রয়োজন নেই। কেননা ভারত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সভ্যতার দেশ এবং তার আছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন ধর্ম।'

জার্মান মহাকবি গ্যোটে, দার্শনিক পণ্ডিত শোপেনহাওয়ার, জগদবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন থেকে ব্রিটিশ সাহিত্যিক টি এস এলিয়টের মতো অগণন ইয়োরোপীয় মনীষী ভারতীয় জীবনচর্যা ও ধর্মের জয়গানে অতীতকে মুখর করে রেখেছেন। সে বর্ণনা দেওয়ার প্রচেষ্টা নিরর্থক, কেননা তা অন্তহীন।

আমরা কেবল সশরীরে ভারতে ব্যয়িত-জীবন কয়েকজন ভারতপ্রেমিক, হিন্দুধর্ম হিতৈষীর ভারত সংশ্লিষ্ট জীবনকাহিনি আলোচনা করলাম। এঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদেরই অনুধাবন করাবার বারবার চেষ্টা করেছেন। যা হয়তো বৃথা যায়নি। ভ্রান্ত দর্শন, বিকৃত ইতিহাস, রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপক নীতিভ্রষ্টতার ও অনাচারের আবিলতা সরিয়ে এক পর্বান্তরের পালা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় দেশ উন্মুখ। ভারতের কেন্দ্রবিন্দুতে উদ্ভাসিত হচ্ছেন কোনো সংসার ত্যাগী প্রচারক বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ভারতাত্মার দূষণমুক্তি সমাসন্ন। এখন আর ভিনদেশী পরানুকরণ নয়, ভাড়া বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য নয়, এখন সময় এসেছে সেই মহামানব গীত মহাসঙ্গীতটির রূপায়ণ 'মন চল নিজ নিকেতনে'। অভীষ্ট ভারত।

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

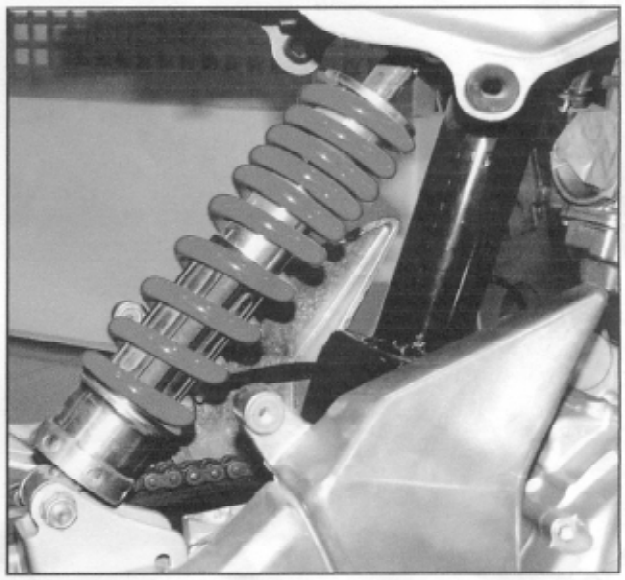

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs

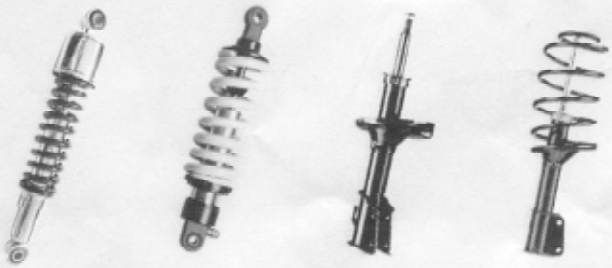

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

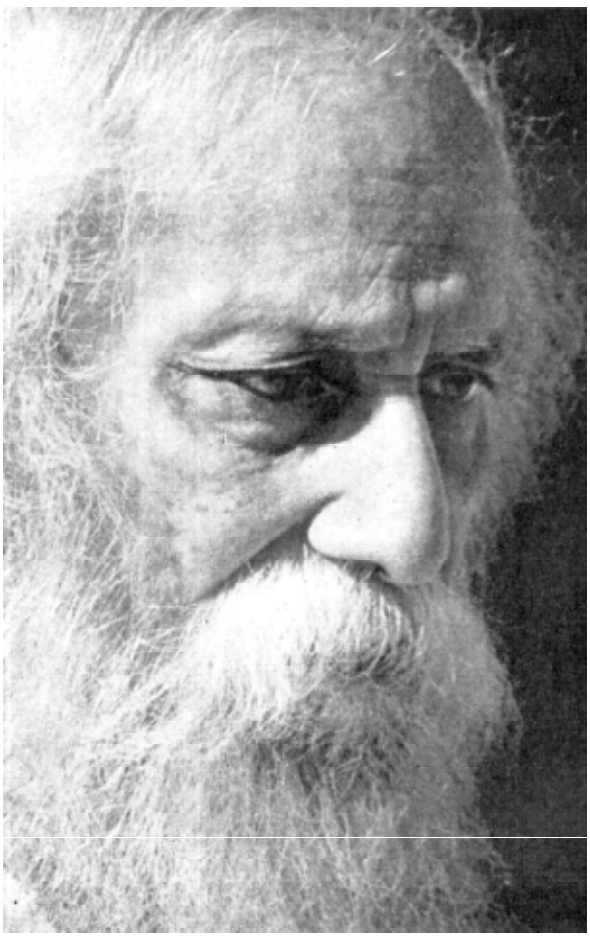

রবীন্দ্রনাথ ও কবি দিকশূন্য ভট্টাচার্য

অর্ণব নাগ

ভারতী পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো একটি কবিতা 'দুদিন'। লেখক অনামা দিকশূন্য ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, 'মাসিক সমালোচনী পত্রিকা' *ভারতী*-র সম্পাদক তখন মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরেজি সন তারিখের নিরিখে ১৮৮০ সালের মে-জুন নাগাদ দিকশূন্য ভট্টাচার্যের 'দুদিন' কবিতাটির প্রকাশ। প্রেমের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি হিসেবে কবিতাটি যে পাঠকের আদরণীয় হয়ে উঠবে তা সমকালে নিশ্চয়ই ঠাহর করা গিয়েছিল। কিন্তু লেখক দিকশূন্য ভট্টাচার্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যায়নি।

ভারতী পত্রিকার সূচনা এই কবিতাটি প্রকাশের কয়েক বছর আগেই হয়েছে। কবিতা প্রকাশকালে *ভারতী*-র চতুর্থ বর্ষ চলছে। কিন্তু নবজাতক এই পত্রিকা বাঙালি পাঠকমহলে রীতিমতো সাড়া ফেলেছিল। কারণ, এর পেছনে ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্যম। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকলেও মূল উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন :

> জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিকপত্র বাহির করিতে হইবে। আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, তত্ত্ববোধিণী পত্রিকাকে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মতো একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকেই সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না, আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।' (*পুরাতন প্রসঙ্গ*, বিদ্যাভারতী, ১৩৭৩ ব. পৃঃ ২৯৭)।

ভারতীর প্রথম দিকের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছাড়াও কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রমুখ আদি ব্রহ্মসমাজের মানুষজনও ছিলেন। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা ছিল। যার পরিচালন ভার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যরাই বইতেন। তা সত্ত্বেও *ভারতী*র মতো পত্রিকার আবির্ভাবের প্রয়োজন পড়ল কেন, তার আভাস দ্বিজেন্দ্রনাথ দিয়েছেন, স্পষ্ট করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনায়, সাহিত্য আলোচনার জায়গা সেটি ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শন আলোচনার উপযুক্ত স্থান *তত্ত্ববোধিনী* হলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অক্ষয় চৌধুরী আর কিশোর রবীন্দ্রনাথের আড্ডায় উদ্ভাবিত সাহিত্য আলোচনার পক্ষে *তত্ত্ববোধিনী* নেহাতই দুর্গম। মূলত এই কথা চিন্তা করেই *ভারতী* পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

ভারতী পত্রিকার চল্লিশ বছরপূর্তি উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'কবির নীড়' প্রবন্ধে লিখেছেন :

'আমি তেতালায় যে ঘরটিতে বসতুম, সেখানে একটি গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি। আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমার নিত্যসঙ্গী (বালক-কবি তখন জগৎ-কবি হননি), আর এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিন জনে যখন একত্র এই টেবিলের চারিধারে বসতুম, কত গাল-গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হত, কত গান-বাজনা হত, গান রচনা হত তার ঠিকানা নেই। পাখীর গানে যেমন ছাদটা মুখরিত হত, এই দুই কবি বিহঙ্গের গানে ও কবিতা পাঠে বৈঠকখানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হত।

একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি— কি-শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল— এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে আকাশেই উড়ে বেড়াচ্চে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্চে। লোকালয়ের কোন কুঞ্জ-কুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কতলোকে ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতলায় নেমে এলুম!

দোতলার দক্ষিণ-বারান্ডায় আর একটি প্রবীণ বিহঙ্গরাজের (দ্বিজেন্দ্রনাথ) আসন ছিল। আসনটি জমিতে থাকলেও তিনি স্বপ্নরাজ্যেই উধাও হয়ে অষ্টপ্রহর বিচরণ করতেন। তাঁর সুললিত অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে আমাদের সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বুঝতেই পারচ তিনি কে। আমার প্রস্তাব শোনবা মাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী *ভারতী* -কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে, নবীন কবি বিহঙ্গদের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন। সেই অবধি দেবীর পূজা অর্চ্চনা হয়ে আস্‌চে। কিছুকাল পরে, দেবীর হাতের বীণাটি সোনার দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়, তারপর এখন আবার সেই স্বর্ণ-বীণাটি মণি-ভূষণে ভূষিত হয়েছে। একেই বলে 'মণি-কাঞ্চনের যোগ'। (*ভারতী*, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃঃ ৭)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অনবদ্য ভাষ্য প্রমাণ করে যে *ভারতী* পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা প্রকাশের একটি মঞ্চকে বিকশিত করা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, *ভারতী*-তে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের দার্শনিক কিংবা দর্শনগত ভাবনা-সম্পৃক্ত রচনাগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রামদাস সেন বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো সেকালের নামী-মানীদের রচনাও *ভারতী* পত্রিকার পৃষ্ঠাকে সমৃদ্ধ করেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও হতাশ করেননি। তাঁর 'ভানুসিংহের কবিতা' কিংবা 'কবি কাহিনী'র মতো কবিতাগুলি *ভারতী* -তে প্রকাশিত হচ্ছিল। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম জ্ঞাত হওয়ার উপায় হয়তো সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে ছিল না। কারণ তাঁর কবিতাগুলি সবই অস্বাক্ষরিত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পুস্তক-এর দীর্ঘ সমালোচনা (বুক রিভিউ) করেন। সেটিও অস্বাক্ষরিত। ভারতীর বার্ষিক সূচিপত্রেও তখন লেখক-লেখিকার নাম থাকতো না, যা দেখেও অন্তত প্রবন্ধ বা কবিতা লেখকদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেখানে ওই রচনাগুলি ঠাঁই পায়। সেই সূত্রে ওই কবিতাগুলির রচয়িতা যে তিনিই, তা জানা যায়।

১২৮৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৮১) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ *সন্ধ্যা-সঙ্গীত* । তেইশটি কবিতার মধ্যে অন্তত একডজন কবিতা *ভারতী*তে প্রকাশিত। বাকিগুলি নতুন। কিন্তু কিমাশ্চর্যম্! ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দু-দিন' কবিতাটি অতি সামান্য কিছু পরিমার্জন ও সংযোজনের মধ্যে দিয়ে ঠাঁই পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*-এ। যে কবিতাটি দিকশূন্য ভট্টাচার্যের নামে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। সহজবোধ্য কারণেই রবীন্দ্রনাথ যে দিকশূন্য ভট্টাচার্য নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্র-জীবনে ছদ্মনামের একটি আলাদা মাহাত্ম্য আছে। তাঁর ভানুসিংহ ছদ্মনামটার কথাই সর্বাধিক প্রচারিত। কিন্তু এছাড়াও ই. জে. থম্পসনের Rabindranath Tagore : His Life and Work (১৯২১) বইটির সমালোচনা তিনি বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রবাসীতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আরও একটি ছদ্মনাম আন্নাকালী পাকড়াশী। *ভারতী* পত্রিকাতেও তিনি কিছু সাংকেতিক অক্ষর ব্যবহার করে কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন। কিন্তু *ভানুসিংহের পদাবলী* প্রকাশের আগে প্রকাশিত *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*-এ এই 'দুদিন' কবিতাটি গৃহীত হওয়ার সূত্রে দিকশূন্য ভট্টাচার্যই যে কবির প্রথম 'আনুষ্ঠানিক' ছদ্মনাম তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অবশ্য 'ভানুসিংহের কবিতা'গুলি ভারতীতে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখেও 'ভানুসিংহের কবিতা' প্রকাশিত হয় *ভারতীতে* । এর সর্বশেষ কিস্তি প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের *ভারতীতে* । ভানুসিংহ নামটি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ 'দিকশূন্য ভট্টাচার্য' ছদ্মনামটি গ্রহণ করলেন কেন তা নিয়ে কৌতূহল থেকেই যায়। *ভারতীতে* প্রকাশিত 'পরাজয় সঙ্গীত' (কার্তিক, ১২৮৮), 'তারকার হত্যা' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮), 'সংগ্রাম সঙ্গীত' (ফাল্গুন, ১২৮৮) ইত্যাদি প্রায় ডজনখানেক কবিতা যেগুলি অস্বাক্ষরিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের *সন্ধ্যা-সঙ্গীতে* সেগুলির ঠাঁই হয়। কিন্তু কালানুক্রমিক দিক দিয়ে *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*-এর কবিতাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত 'দুদিন' কবিতাটি প্রকাশের ক্ষেত্রেই তাঁর দিকশূন্য ভট্টাচার্য ছদ্মনাম গ্রহণের প্রয়োজন পড়ল

কেন তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

আমরা এও দেখেছি যে, *ভারতী*-তে সমকালে প্রকাশিত অন্যান্য রবীন্দ্র-রচনাও সিংহভাগ ক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষরবিহীন। এমনকী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিখ্যাত রবীন্দ্র-উপন্যাস 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'ও (কার্তিক, ১২৮৮ - আশ্বিন, ১২৮৯) রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছাড়াই প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবন-স্মৃতি*-তে স্মৃতিচারণা করে বলেছেন—

> 'ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালীর কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা। যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলি ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে, কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।'

বিশ্বকবির এহেন স্বীকারোক্তিতে অতিশয়োক্তির সম্ভাবনাকে নস্যাৎ না করেও বলা যায় লজ্জার অভিমানে সন্ধ্যার কবিতাগুলি পরবর্তীকালে বহুবার পরিমার্জন রবীন্দ্রনাথ করেছেন; পুলিনবিহারী সেন, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় একাধিকবার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সমকালে *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*ের কবিকেই মালা পরিয়েছিলেন সাহিত্য জগতের মধ্যাহ্নে দেদীপ্যমান সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রবান্ধব প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পুনস্থাপনেও *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*-এর অপরিসীম অবদানের কথা কবিগুরু তাঁর জীবন-স্মৃতিতে স্বীকার করেছেন।

আপাতত আমরা দেখে নিতে পারি দিকশূন্য ভট্টাচার্যের 'দুদিন' কবিতার পূর্ণ বয়ান। সেইসঙ্গে *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*-এর প্রথম সংস্করণের মূল পাঠ মিলিয়ে দেখারও অবকাশ থাকছে। খুব পরিবর্তন যে হয়নি সে কথা আগেই বলেছি। যতিচিহ্ন আর বানানের সামান্য অদলবদল আমরা বিবেচনায় রাখছি না। পাঠভেদই আমাদের মূল উপজীব্য। *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত দিকশূন্য ভট্টাচার্যের 'দুদিন' কবিতাটি ছিল এরকম—

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুল পত্রহীন;
অর্দ্ধমৃত পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি মাতা, শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা

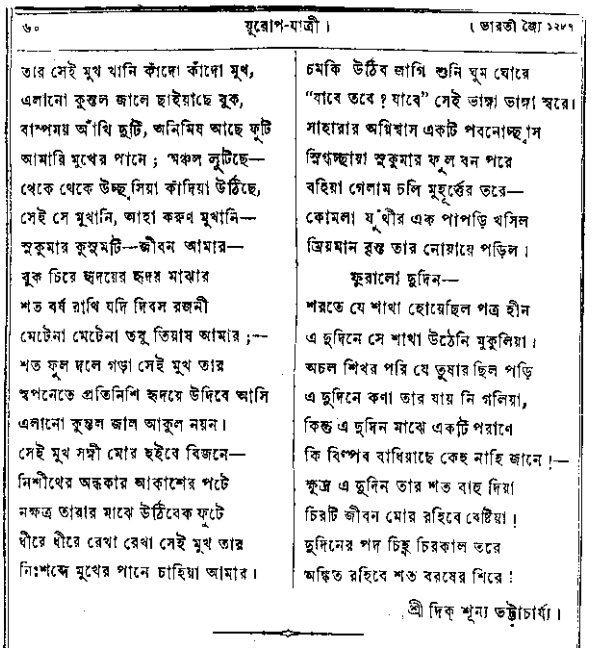
৬০ যুরোপ-যাত্রী। [ভারতী জ্যৈ ১২৮৭

তার সেই মুখ খানি কাঁদো কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,
বাষ্পময় আঁখি দুটি, অনিমিষ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে ; অঞ্চল লুটিছে—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,
সেই সে মুখানি, আহা করুণ মুখানি—
সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটেনা মেটেনা তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুল দলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র তারার মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।

চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে
"যাবে তবে ? যাবে" সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।
সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার ফুল বন পরে
বহিয়া গেলাম চলি মুহূর্ত্তের তরে—
কোমলা যুথীর এক পাপড়ি খসিল
ম্রিয়মান বৃন্ত তার নোয়ায়ে পড়িল।
ফুরালো দুদিন—
শরতে যে শাখা হোয়েছিল পত্র হীন
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
অচল শিখর পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দুদিনে কণা তার যায় নি গলিয়া,
কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে !—
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
দুদিনের পদ চিহ্ন চিরকাল তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে !

শ্রী দিক্ শূন্য ভট্টাচার্য্য।

কুজ্‌ঝটি-বসন খানি দেছেন টানিয়া;
পশ্চিমে গিয়াছে[১] রবি স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু[২] শ্রান্ত পথিক একেলা।

রহিনু দুদিন
এখনো রোয়েছে শীত— বিহঙ্গ গাহেনা গীত
এখনো ঝরিছে পাতা পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণ-ভরা চুম্বন পরশে
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত শয্যা হোতে ধরা জাগেনি হরষে।
একদিন দুই দিন ফুরাইল শেষে
আবার উঠিতে হোল চলিনু বিদেশে।

একখানা ভাঙ্গা লঘু মেঘের মতন
কত গিরি হোতে গিরি বেড়াতেছি ফিরিফিরি
যেদিকে লইয়া যায় অদৃষ্ট পবন
আসিলাম একবার শুভদৈব বলে
ফুলে ফুলে ভরা এক হরিত[৩] অচলে
রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া— নির্ঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্রধনু নিরমিয়া খেলিলাম কত,
ডুবে গেনু জোছনায়, আঁধার পাখার গায়
বসালেম তারা শত শত।

ফুরালো দুদিন—
সহসা আরেক দিকে বহিল পবন
দুদিনের খেলা ধূলা ফুরালো আমার
আবার— আরেক দিকে চলিনু আবার।

এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পূরবে,
আর কি গো[৪] এ জীবনে ফিরে আসা হবে?
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর—
ঘটনা ঘটিবে শত[৫], বরষ বরষ কত[৬]
জীবনের পর দিয়া হোয়ে যাবে পার;
হয় ত গো[৭] এক দিন অতি দূর দেশে
আসিয়াছে সন্ধ্যা হোয়ে, বাতাস যেতেছে বোয়ে
একেলা নদীর তীরে[৮] রহিয়াছি বোসে,
হু-হু কোরে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা, সহসা দিবেক[৯] দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে
দুয়েকটি সুর তার উদিবে স্মরণে।
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সে দিনের কথা গুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা দুদিনের তরে হেথা এনু
একটি কোমল হৃদি[১০] ভেঙ্গে রেখে গেনু
তার সেই মুখ খানি কাঁদো কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,
বাষ্পময় আঁখি দুটি, অনিমিষ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে; অঞ্চল লুটিছে—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,
সেই সে মুখানি, আহা করুণ মুখানি—
সুকুমার কুসুমটি— জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শতবর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে না মেটে না তবু তিয়াষ আমার;—
শত ফুল দলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন।[১১]
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র তারার মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে
'যাবে তবে? যাবে' সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।
সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার ফুল বন পরে[১২]
বহিয়া গেলাম চলি মুহূর্তের তরে[১৩]
কোমলা যুথীর এক পাপড়ি খসিল
ম্রিয়মান বৃন্ত তার নোয়ায়ে পড়িল।

ফুরালো দুদিন—
শরতে যে শাখা হোয়েছিল পত্র হীন
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
অচল শিখর পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দুদিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,
কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে!
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া!
দুদিনের পদ চিহ্ন চিরকাল[১৪] তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে।

(*ভারতী*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭, পৃঃ ৫৯-৬০)

বানান ভেদ, যতি-চিহ্নের অদলবদল ব্যতিরেকে মাত্র বছর দেড়েকের ব্যবধানে সন্ধ্যা-সঙ্গীতে গ্রন্থিত এই কবিতায় যে সামান্য পাঠভেদ দেখা যায় সংখ্যা দ্বারা তা চিহ্নিত হয়েছে। দু-একটি বর্ণশুদ্ধি আমরা সংশোধন করে নিয়েছি। আপাতত পাঠভেদের দিকে তাকানো যাক। পাঠভেদ গৃহীত হয়েছে *সন্ধ্যা-সঙ্গীত*-এর প্রথম সংস্করণ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত) থেকে।

১) গিয়াছে — গিয়েছে
২) আসিনু — আইনু
৩) হরিত — শ্যামল
৪) কিগো — কিরে
৫) শত — কত
৬) কত — শত

৭) হয়ত গো — হয়ত বা

৮) তীরে — ধারে

৯) দিবেক — দিবে রে

১০) হৃদি — প্রাণ

১১) এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন — এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে

১২) এই সারণিটি এর পরের সারণি 'বহিয়া গেলাম'-এর পরে বসবে।

১৩) এই সারণিটি এর আগের সারণি 'সিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার'-এর পূর্ববর্তী হবে।

১৪) চিরকাল — চিরদিন।

কবিতার বিভিন্ন বর্ণনায় যেমন 'পড়িছে নীহার জাল', 'বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা', 'হয়ত গো এক দিন অতি দূর দেশে' ইত্যাদির মাধ্যমে রচনাটি যে রবীন্দ্রনাথের সদ্য বিলেতবাসের অভিজ্ঞতা প্রসূত তা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। *রবিজীবনীকার* প্রশান্ত কুমার পালের অভিমত : 'বিলাত ত্যাগের মুহূর্তে বা তার অব্যবহিত পরে দুদিন কবিতা রচিত হয়েছিল। বাস্তব বেদনার অব্যবহিত অভিঘাত কবিতাটির সর্বাঙ্গে, ফলে কাব্যরসের দিক দিয়ে এটি খুব উচ্চস্তরের নয়।' (*রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড; আনন্দ, ২০১১, পৃঃ ৮৯)।

বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে শীতকালে লন্ডন প্রবাসের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতিতে* লিখেছেন। সেখানে ডা. স্কট, তাঁর পত্নী ও মেয়েদের কথাও রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে পরিস্ফুট। তিনি লিখেছেন, 'অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইহাদের (স্কট পরিবার) ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।' (জীবনস্মৃতি, ১৪২১ ব., পৃঃ ১০০)। দিলীপকুমার রায়ের কাছে স্কটভগিনীদের সম্বন্ধে তিনি কবুল করেছিলেন, 'দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালবাসত এ কথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই— কিন্তু তখন যদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকিত।' এই সূত্রেই *রবীন্দ্রজীবনী*কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারণা স্কট-কুমারীদের একজনের প্রতি অনুরাগবশত রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি রচনা করেন। তাঁর তথ্য : 'মালতী পুঁথিতে', 'ফুরানো দুদিন' নামে একটি কবিতার নানা পাঠ আছে। আমাদের মনে হয়, কবিতাটির খসড়া বোম্বাই বাসকালে প্রথম করেন। বিলাত হইতে ফিরিবার তিন মাস পরে স্কটকুমারীদের স্মরণ করিয়া 'ফুরানো দুদিন' মালতীপুঁথির পাঠ পরে মার্জন করিয়া ভারতীতে দুইদিন (পরে 'দুদিন' হয়) নামে প্রকাশ করেন।' (*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃঃ ৯৩)।

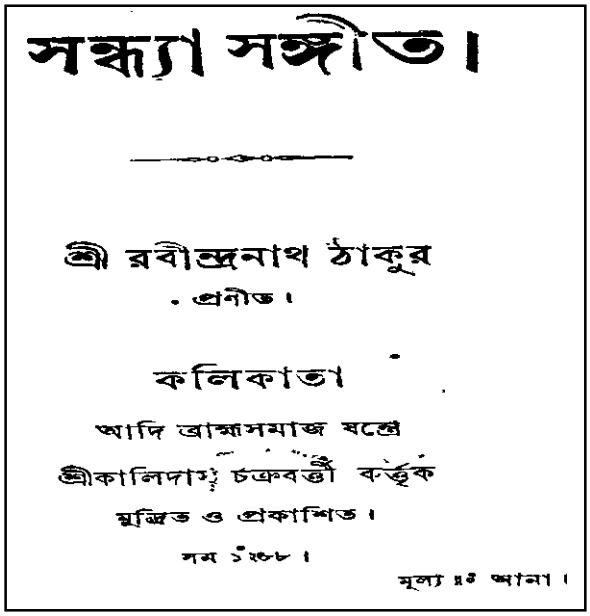
সন্ধ্যা সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৮৮।
মূল্য ।৵ আনা।

প্রভাতবাবুর এই যুক্তিকে গ্রহণ করতে পারেননি পরিমল গোস্বামী। রবীন্দ্রনাথের 'দিকশূন্য ভট্টাচার্য' নাম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা : 'মনে হয় এর প্রথম প্রকাশকালে মনে কিঞ্চিৎ ভীরুতা জন্মে থাকবে। হয়তো তাঁর নিজের মনের কাছে এ কবিতায় তিনি নিজেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ধরা দিয়ে বসেছেন বলে মনে হয়েছে। অথবা 'দিকশূন্য' নাম (যার অর্থ দিশাহারা) ব্যবহারের মধ্যে নিজের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণামিশ্রিত তিরস্কার প্রচ্ছন্ন থাকাও অসম্ভব নয়। অর্থাৎ নিজেকে একটি অবিমৃষ্যকারী দিগ্‌ভ্রান্ত ছোকরারূপে দেখার মাতব্বরিটুকু উপভোগ করা।' পরিমলবাবু রবীন্দ্ররচনার পংক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন : 'দিকশূন্য, অথচ তিনি যে পুবদিকে রওনা হচ্ছেন সে বিষয়ে জ্ঞান বেশ পুরোপুরিই আছে।' ('রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, বৈশাখ, আষাঢ়, ১৩৬৯, পৃঃ ৪২১-৪২২)।

রবীন্দ্রনাথ *সন্ধ্যা-সঙ্গীত* প্রসঙ্গে জীবন-স্মৃতিতে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করে বলেছেন :

> 'কাব্য হিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।' (জীবনস্মৃতি, ১৪২১ ব., পৃঃ ১২১)।

জানা নেই যে এ খুশির মূল্যের দাম তিনি দিকশূন্যতার উদ্ভাসে মিটিয়েছিলেন কিনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকারেরাও সে হদিশ দিতে পারেননি। আমাদের ধরে নিতে আপত্তি কোথায়?■

উপন্যাসোপম কাহিনি

সম্ভবামি

প্রবাল চক্রবর্তী

আজ থেকে প্রায় এগারো হাজার বছর আগের এক গোধূলিবেলা।

দুকূল ছাপিয়ে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে সুরধুনী গঙ্গা। তার পতিতপাবনী স্রোত নিরন্তর ধুইয়ে চলেছে নদীর দুই তীর। মধ্যভাগ থেকে সেই দুই তীর শুধুই অস্পষ্ট ধোঁয়াশার মতো দেখায়, গঙ্গার এমনই ব্যাপ্তি এখানে। এমনিতে তো এখানে হইচই কোলাহল কিছুই থাকে না। স্বচ্ছ নির্মল আকাশে খেচরকুল উড়ে বেড়ায় নদীর ধারে ধারে। বনের পশুরা নির্ভয়ে জল খেতে আসে। গোধূমের ক্ষেত দুই তীরকে রাঙিয়ে রাখে সোনালি রঙে। কৃষকদের উদাত্ত কণ্ঠের গান মিশে যায় নদীর তরঙ্গে অবগাহনরত ধীবর-নৌকা থেকে ভেসে আসা মনকাড়া সুরে। কিন্তু আজ ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ নদীর দুই ধার ধরে অসংখ্য মহিষের সমাবেশ। পৃষ্ঠদেশ ও শৃঙ্গ তাদের ধাতব বর্মে ঢাকা, তাদের খুরের ঘর্ষণে আকাশ ধূলিধূসর। নদীর দুই ধার ধরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে দিকে। সুরধুনীর পূত বাতাস আজ দূষিত সভ্যতার বহ্নুৎসবের গন্ধে। সে গন্ধ বিবমিষা-উদ্রেককারী। বন্য পশুরা নদীর অববাহিকা ছেড়ে পালিয়েছে বহু দূরে। খেচরকুল আজও উড়ছে আকাশে। কিন্তু না, দোয়েল শ্যামা ফিঙে চন্দনা কাকাতুয়া মাছরাঙা নয়, আজ আকাশে শুধুই নরমাংসভোজী শকুনি-গৃধিনীদের ভিড়।

মাত্র একরাতের মধ্যে স্বর্গ পরিণত হলো নরকে।

গঙ্গার অববাহিকায় বসবাসকারী বরুণ- উপাসকদের গ্রামগুলির ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে গতকাল রাত থেকে। অতর্কিত সেই আক্রমণে অধিকাংশ বসতি ধ্বংস হয়েছে। অগণিত বরুণ-উপাসক মৃত্যুবরণ করেছে। বাকিরা নৌকা করে পালিয়ে মা-গঙ্গায় আশ্রয় নিয়েছে। নদীর মধ্যভাগে তাই আজ সহস্রাধিক নৌকার জটলা। সেই নৌকাগুলি থেকে মাঝেমাঝেই ইতস্তত ভেসে আসছে শিশুদের ক্রন্দনধ্বনি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে নৌকা, তারই মধ্যে সপার্ষদ বসেছিলেন বরুণ-প্রমুখ। গঙ্গা-অববাহিকায় বহু সহস্র বৎসর ধরে গড়ে ওঠা বরুণ-উপাসকদের সভ্যতা আজ তাঁর চোখের সামনেই মাত্র কয়েক প্রহরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে বাস্তবটা এখনও ঠিক করে গলাঃধকরণ করে উঠতে পারেননি উনি। কোথায় ভুল হলো?

সায়ংকাল সমাসন্ন। সভ্যতার সায়ংকাল। উইপোকার মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে দানবরা। যেখানে তাদের পদচিহ্ন পড়ছে, ছারখার হয়ে যাচ্ছে মানবসমাজ। শুরু হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের রাজত্ব। সভ্যতা বলে আর কিছু থাকছে না সেখানে। বারো বছর আগে, মহিষ-বাহিনীর খুরের তলায় অগ্নি-উপাসকদের সভ্যতা যেদিন মর্দিত হয়েছিল, উনি শঙ্কিত হননি। সত্যি বলতে কী, অগ্নি-উপাসকদের কোনোকালেই পছন্দ করতেন না বরুণ। কিন্তু দনুর পৌত্র সেই ধর্মত্যাগী যেদিন সূর্য-উপাসকদের পরাজিত করল, সেদিন থেকেই অমঙ্গলের আশঙ্কা বরুণের অন্তরে সদাজাগ্রত। মিত্র ছিল বরুণের ভ্রাতৃপ্রতিম। মিত্র-বরুণের যুগলবন্দি পৃথিবীকে শাসন করেছে সহস্রাধিক বছর। সূর্যদেবের পরাজয় তাই বরুণকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। সেদিন থেকেই রাতে দিনে শয়নে জাগরণে তিনি কালাপাহাড় সেই দানবকে রোধ করার উপায় অন্বেষণ করে গেছেন। কিন্তু সে সবই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হল। আজ স্নায়ুমণ্ডলী তাঁর বশে নেই আর। মাঝেমাঝেই শিউরে উঠছেন। পাশে রাখা মদিরা-পূর্ণ ঘটি থেকে একঢোঁক করে আসব পান করছেন। আশা, এতে তাঁর বিপর্যস্ত স্নায়ুমণ্ডল শাসনে আসবে।

বরুণকে ঘিরে বসে আছে অন্য নৌকার প্রধানরা। তারাও সবাই দিশেহারা। প্রতীক্ষা করছে, কখন বরুণ প্রমুখ কিছু বলবেন। বরুণের এই দীর্ঘ নীরবতা ও তাঁর স্নায়ুদৌর্বল্য অন্য নেতাদেরও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। মরিয়া হয়ে এদের মধ্যে একজন বলে উঠল—

'এভাবে বসে থাকলে তো চলবে না। সন্ধ্যা নামছে। যা করার রাত্রির অন্ধকারেই করতে হবে।'

'কী করার কথা ভাবছ তুমি?' প্রশ্ন আরেকজনের।

'সামনে বিকল্প একটিই'— বলল প্রথমজন। 'রাতের আঁধারের সুযোগ নিয়ে তীরে ফিরে গিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালানো। শুনেছি মহিষদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। রাতে ওরা আরও কম দেখে। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি আমাদের নখদর্পণে। আর রাতে যদি একটা সর্বাত্মক চেষ্টা করা যায়, মহিষাসুরের সৈন্যবলের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যাবে।'

'তুমি যেটা বলছ, সেটা আত্মহত্যার নামান্তর'— বলল দ্বিতীয়জন— 'এরকম একটা আক্রমণ শেষে আমরা কেউই বেঁচে ফিরব না।'

'তুমি তো বলবেই একথা'— বলল প্রথমজন, 'শুনেছি দনু ছিলেন তোমার পিতার মাতৃস্বসা। দনুর বংশজ বরুণ-উপাসনা ছেড়ে অসু-উপাসনা ধরেছে, বরুণদের কচুকাটা করছে সারা উত্তরাপথে, তবু তোমার দুর্বলতা গেল না তার ওপর।'

'সপরিবারে আত্মহত্যা করে বরুণদেবের কী উপকার করব আমরা?'— বলল দ্বিতীয়জন।

'এভাবে বাঁচার থেকে লড়াই করে মরা ভালো'— বলল প্রথমজন, 'তুমি কি জানো না, মহিষাসুর প্রতিদিন সূর্য-উপাসকদের ওপর কীরকম অত্যাচার চালাচ্ছে? ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আজ রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন আমার

কাছে অধিক কাম্য।'

'যুদ্ধ করার এতই যদি ইচ্ছা'— বলল দ্বিতীয়জন, 'তবে কয়েক দণ্ড আগে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে নৌকা নিয়ে পালিয়ে এলে কেন মা-গঙ্গার আশ্রয়ে? ভীরু কাপুরুষের মুখে যুদ্ধের হুঙ্কার শোভা পায় না।'

'সাবধান! নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো।'— ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রথমজন।

পাশে রাখা মদিরা-পূর্ণ ঘটি থেকে আরও একঢোঁক পান করলেন বরুণ। কড়া আসবের স্রোত ধমনীতে লাভাপ্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এই অনুভূতিটাকে কয়েক মুহূর্ত সময় দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'ভাইসব'— বললেন বরুণ, 'এই সংকটের মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে কলহ করবেন না। আপনারা যা বলছিলেন, সবই আমি শুনেছি। আমার অভিমত, প্রতি আক্রমণের সময় এটা নয়। মহিষাসুরের নৌবাহিনী নেই। যতকাল আমরা গঙ্গাবক্ষে আছি, সে আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। ততকাল মা-গঙ্গা আমাদের খাদ্য ও পানীয়, দুইয়েরই সংস্থান করতে সক্ষম।'

'কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য জলে ভেসে বেড়ানো, সেটাও তো কাজের কথা নয়'— বলল একজন, 'কোনো না কোনোদিন তো মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেই হবে। নাহলে আজ যেসব ভ্রাতা-ভগিনীরা হুতাত্মা হলেন, তাঁদের আত্মার সদগতি হবে কীভাবে?'

'সে ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই'— বললেন বরুণ, 'কিন্তু সঠিক সময়ের প্রতীক্ষা করতে হবে। নতুন করে অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। আমার মত, চলুন আমরা গঙ্গার প্রবাহে ভেসে ব্রহ্মারাজ্যে চলে যাই। এই উত্তরাপথে একমাত্র তারাই মহিষাসুরের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করতে সক্ষম।'

'ব্রহ্মা?'— বলল আরেকজন, 'কিন্তু তারা তো কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিম মাতৃ-উপাসক। তারা কেন আমাদের সহায়তা করবে?'

'ব্রহ্মাবাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও অতিথিবৎসল'— বললেন বরুণ, 'শরণার্থী হয়ে তাদের কাছে গেলে তারা আমাদের আশ্রয় দেবেই। তারপর আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো। তাদের বোঝাবো। মহিষাসুরের বিপদ সম্বন্ধে ওরা পুরোপুরি অজ্ঞান, এমনটা তো মনে হয় না। মহিষাসুরের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করলে ওদেরই লাভ। ওদের কাছে উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে, তার ওপর রয়েছে ওদের তন্ত্রমন্ত্র যন্ত্র, ওদের জাদুটোনা। ব্রহ্মার সহায়তা পেলে মহিষাসুরকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব নয়।'

ঠিক সেই সময়, গঙ্গার তটরেখা থেকে অনতিদূরে মহিষচর্ম নির্মিত এক স্কন্ধাবারে বিশ্রাম নিচ্ছিল মহিষাসুর। দু'জন পরিচারিকা নিরন্তর তার অঙ্গসংবাহনে ব্যস্ত। উভয় পরিচারিকাকেই মহিষাসুর সংগ্রহ করেছিল অর্বুদ পর্বতের সূর্যমন্দির থেকে। সূর্য-প্রমুখের দুই কন্যা, এরা এককালে ছিল সূর্যদেবের পূজারিণী। আজ মহিষাসুরের পরিচারিকা ও অঙ্কশায়িনী। সেকথা ভাবতেই মহিষাসুরের শরীর জুড়ে সুখের শিহরণ বয়ে গেল। যুদ্ধক্লান্ত শরীরটাকে আরামে আরেকটু এলিয়ে দিল শয্যার ওপর। এত শারীরিক সুখের মাঝেও মহিষাসুর গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। অনেক টুকরো টুকরো চিন্তা পাক খাচ্ছিল মহিষাসুরের মনে। সেই শিশুবয়সেই দুটি গুরুদায়িত্ব সে তার স্কন্ধে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে। প্রথমটি হলো, সসাগরা এই জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র অসুর আধিপত্য কায়েম করা। যা দৈত্যরা পারেনি, সেটা করে দেখানো। আর তার মধ্যে দিয়েই সিদ্ধ হবে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মহামতী-ত্রয়ী— দিতি অদিতি ও দনুর মধ্যে দনুই যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ হবে।

অগ্নি-উপাসকদের কেন্দ্র ছিল জম্বুদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম, আজ তা মহিষাসুরের অধীনে। সূর্য-উপাসকদের কেন্দ্র ছিল জম্বুদ্বীপের পশ্চিমভাগ, সেই অংশও আজ তার অধীনে। আজকের এই নির্ণায়ক যুদ্ধে গঙ্গা-অববাহিকার বরুণ-উপাসকদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা উত্তরাপথে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াল অসুবাদ। হিমালয়ের বজ্র ও পবন-উপাসকরা এবং ব্রহ্মার মাতৃ-উপাসকরা ছাড়া আর কেউই রইল না উত্তরাপথে যে অসু-র সত্যতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে।

প্রথমে উত্তরাপথ, তারপর দক্ষিণাপথ। শনৈঃ শনৈঃ। সবার অজান্তে রক্তবীজ সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক অসু-নিষ্ঠ গুপ্তচর বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেছে। আগামী ক'বছরের মধ্যেই তারা দক্ষিণাপথের প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে পড়বে। কাঞ্চীপুরম জয় কঠিন হবে না। নাগরিকদের যুদ্ধে হারানো সহজ। দুর্গপ্রাকারের পতন হলেই তারা সুড়সুড় করে আত্মসমর্পণ করে। গোদাবরীর বরুণ-উপাসকদের সঙ্গে লড়াই নির্ণায়ক হবে। তবে আজ বরুণ-উপাসকদের যা বীরত্ব দেখা গেল, তাতে এটা অনুমান করা কষ্টের নয়, গোদাবরী জয়ও অসম্ভব নয়। একবার মহিষ-বাহিনী নিয়ে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করতে পারলেই হলো।

কিন্তু বিষ্ণু? আর সবারই ব্যবস্থা করা যাবে, বিষ্ণুর কী হবে? কোনো চাটুকারিতা, কোনো স্তুতি, কোনো ভীতিপ্রদর্শনই আজ পর্যন্ত বিষ্ণুকে টলাতে পারেনি। বিষ্ণু সর্বত্র রয়েছে। অথচ তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কৃতান্ত অদৃশ্য,

জলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় যে অগণিত দেশবাসীর ভিড়ে মিশে থাকে, তাকে কীভাবে ধ্বংস করা যায়? নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছেন, তাই দেশবাসী বিশ্বাস করে, তিনি একদিন মহিষাসুরকেও হত্যা করবেন। দেশবাসীর এই বিশ্বাসই আজ অসুবাদের প্রধান অরি। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, অসু-র প্রাধান্যে আজ সবচেয়ে বড় বাধা হলো বিষ্ণু। কিন্তু সেকথা পরে ভাবা যাবে। আজকের কাজ অন্য। 'উগ্রবীর্যকে ডেকে পাঠাও' — চোখ না খুলেই বলল মহিষাসুর।

দুই অঙ্গসংবাহিকার একজন ক্ষিপ্রপদে শিবিকা থেকে নির্গত হলো। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবিকার মধ্যে এসে ঢুকলো খর্বাকৃতি স্থূলবপু এক ব্যক্তি। নাম উগ্রবীর্য হলেও চেহারায় তার বীর্যের নামমাত্র নেই। সেই খামতি ঢাকার জন্য উগ্রবীর্যের বাড়াবাড়ি রকমের সাজপোশাক মোটেই দৃষ্টিনন্দন নয়।

'পৌত্তলিকগুলোর কী সংবাদ?'— প্রশ্ন মহিষাসুরের।

'ওরা সবাই নৌকা নিয়ে নদীর মধ্যভাগে জড়ো হয়েছে, মহামহিম। নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারে আমাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। আমি বলি কী, এখনই গিয়ে ওদের আক্রমণ করি। আমাদের মহিষগুলোও তো সাঁতারে খুব পটু। ওগুলোকে নিয়ে...'

'মূর্খ!'— ধমক দিল মহিষাসুর— 'বুদ্ধি খাটানো তোমার কর্ম নয়, সে চেষ্টা কোরো না। আক্রমণ নয়, ওরা ব্রহ্মায় পালানোর মতলব করছে।'

'তাহলে তো ভালোই। আপদ বিদায় হবে।'

'সাধে কি তোমাকে মূর্খ বলি? একটু আগেই বলছিলে, বরুণদের সঙ্গে জলে নেমে যুদ্ধ করতে যাবে। যারা আজন্ম জলের মানুষ তাদের সঙ্গে তুমি যাচ্ছিলে জলে যুদ্ধ করতে। আর এখন বলছ, বরুণরা ব্রহ্মায় পালালে ভালো হয়। আমার দুই প্রধান প্রতিপক্ষ একত্রিত হলে তোমার ভালো হয়! মাঝেমাঝে আমার সন্দেহ হয়, তুমি কোন পক্ষে আছ!'

'কিন্তু মহামহিম', উগ্রবীর্যের কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাস, 'জলে না নেমে বরুণদের মারবোই বা কীভাবে? আর ওদের ব্রহ্মায় পালানো আটকাবোই বা কীভাবে?'

ইশারায় উগ্রবীর্যকে কাছে ডেকে নিল মহিষাসুর। দ্রুত তার কানে ফিসফিস করে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর চোখ বুজে আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ল। উগ্রবীর্য দৌড়লো মহিষাসুরের আদেশ তামিল করতে। দ্বিতীয় অঙ্গসংবাহিকা, যে উগ্রবীর্যকে ডাকতে গিয়েছিল, সে এতক্ষণ শিবিকার দ্বারে দাঁড়িয়েছিল। তড়িঘড়ি এসে সে মহিষাসুরের সেবায় রত হলো। মহিষাসুর তাকে ফিসফিস করে বলল, 'এতক্ষণ বেশ বিশ্রাম নিলে যাহোক। আজ রাতে এর শোধ তুলবো।'

চোখ ফেটে জল এল অঙ্গসংবাহিকার। হে সূর্যদেব! কবে এই নরক থেকে মুক্তি হবে?'

দশদিক রাঙিয়ে সূর্যদেব ডুব দিলেন গঙ্গায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপসি আঁধার নামলো নদীবক্ষে। তার ঠিক একদণ্ড পরে মহিষাসুরের স্কন্ধাবার থেকে নির্গত হয়ে দুটি মহিষ সন্তর্পণে নদীতে নামলো। একটি মহিষের পিঠে একজন আরোহী, অন্যটির পিঠে একটি পিপে। জলমধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে এরা ধীর সতর্ক সন্তরণে বরুণ-নৌবহরের দিকে এগোতে থাকলো। নৌবহরের ত্রিশ হস্ত দূরে এসে থামলো তারা। আরোহী প্রথমে অন্য মহিষটির গলা থেকে পিপের বন্ধন খুলে দিল। খুলে দিল পিপের ছিপি। এক ধাক্কায় পিপেটিকে জলস্রোতে ভাসিয়ে দিল। তারপরই পায়ের চাপে ইশারা করল নিজের বাহনটিকে। সে মহিষ তীব্রগতিতে সাঁতরাতে শুরু করল পাড়ের দিকে, পিছু পিছু অন্য মহিষটি। ওদের ফেলে যাওয়া পিপেটি অর্ধনিমগ্ন প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় জলস্রোতে ভাসতে ভাসতে একসময় বরুণ-নৌবহরের একেবারে মধ্যিখানে এসে পড়ল। একটি নৌকার গায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই থিতু হলো। পিপের উন্মুক্ত মুখ থেকে নির্গত হয়ে তরল এক পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল জলে। আশ্চর্য গুণ সে তরলের। জলে মিশ্রিত হয় না, ভেসে থাকে জলের উপরিভাগে। স্বাদগন্ধহীন সেই তরলকে জল থেকে আলাদা করে চেনাও যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কেউই সেই তরলের স্তরকে খেয়াল করল না। পিপেটাও নজরে পড়ল না কারোর।

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙ্গলো বরুণ-প্রমুখের।

মধ্যরাত এখন। প্রথমেই যেটা মনে হলো, সেটা হলো নৌকা স্থির হয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ স্থির নয়, স্রোতের ধাক্কায় যেটুকু দুলুনি হয়, সেটুকুই। চলন্ত নৌকায় এর থেকে অনেক বেশি দুলুনি থাকা উচিত। নৌবহর কি এখনও যাত্রা শুরু করেনি? নির্দেশ তো ছিল, রাত্রিভোজনের পরেই যাত্রা শুরু

করার। অবশ্য রাত্রিভোজন পর্যন্ত জেগে ছিলেন না বরুণ-প্রমুখ। মদিরার প্রভাবে তার আগেই শয্যাগ্রহণ করেছিলেন। রাত্রিভোজন না করেই।

নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালেন বরুণ। সামনের দৃশ্যটা দেখে তাঁর মেরুদণ্ড বরাবর একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল। দেখলেন, নৌকার যাত্রীরা রাত্রিভোজনের আসনে বসা অবস্থাতেই ঢলে পড়ে রয়েছে মাটিতে। ভোজন শেষ না করেই। তাদের মাটিতে পড়ে থাকার ভঙ্গিতে এটা পরিষ্কার, তারা কেউই আর বেঁচে নেই। তবুও এক এক করে সবার নাড়ি পরীক্ষা করলেন। না, কেউই বেঁচে নেই। প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে অতর্কিতে— যন্ত্রণাহীনভাবে, ভোজনরত অবস্থায়। একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি মারল। বরুণ-প্রমুখের নৌকার সংলগ্ন ছোট্ট একটি ছিপনৌকা ছিল। সন্দেহ নিরসন করতে সেটিতে চড়ে এক এক করে বাকি নৌকাগুলিও ঘুরে দেখলেন বরুণ। সবকটি নৌকার প্রতিটি বাসিন্দাই মৃত।

বুক ফেটে কান্না এল বরুণের। কিন্তু না, শোকের সময় নয় এটা। যে মহিষাসুর এত দূর থেকে এতগুলো মানুষকে মন্ত্রবলে হত্যা করতে পারে, তার থেকে যত শীঘ্র সম্ভব যতদূরে পালিয়ে যাওয়া যায়, ততই ভালো। দুটি দাঁড়ের দ্রুত অভিঘাতে ও গঙ্গার অনুকূল স্রোতে ছিপনৌকা এগিয়ে চলল ভীমগতিতে। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল সেই অঞ্চল, যেখানে মহিষাসুরের সৈন্যরা শিবির করেছে। কিছুক্ষণ পরে বহ্নিমান গ্রামগুলির আগুনের আভা ফিকে হয়ে এল, ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলিও অদৃশ্য হল দিগন্তের পারে। আরও কিছুক্ষণ নৌকা বাওয়ার পর দূরে সমুদ্রসমান গঙ্গাবক্ষে বিন্দুর মতো দেখা দিল ছোট্ট একটি বালির চড়া। জায়গাটি বরুণের ভারী চেনা। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে সেই চড়ায় উঠে বরুণ ছিপনৌকাটিকে ঠেলে দিলেন জলে। স্রোতের টানে নৌকা আবার পূর্বমুখী পথ ধরল। হাত-পা ছড়িয়ে বালির চড়ায় মৃতবৎ শুয়ে পড়লেন বরুণ। প্রাণভরে কাঁদলেন। তারপর নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লেন। একদণ্ড এইভাবেই অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ বালির চড়ায় জাগলো কম্পন। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বরুণ। ঊষার ছায়ান্ধকারে আলোড়ন জাগিয়ে বিশালাকায় এক কুম্ভীর জল ছেড়ে উঠে এল। বিশ হাত লম্বা, এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে গা থেকে জল ঝরছে। জ্বলন্ত দুটো চোখে শীতল আগুন। বরুণের সামনে এসে মাথা নীচু করে স্থির হল সে। কদাকার সেই মহা-সরীসৃপের পিঠে উঠে বসলেন বরুণ। তাঁকে নিয়ে বাহন জলে ঝাঁপ দিল। তোলপাড় জল কেটে তীব্রগতিতে রওনা দিল পূর্বদিকে। কয়েক প্রহর একইভাবে এগোনার পর বরুণ দিকপরিবর্তন করলেন। গঙ্গা থেকে একটি শাখানদী বেরিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে মধ্যভারতের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। বরুণ সেই শাখানদীটি ধরলেন।

না ব্রহ্মা নয়, যত শীঘ্র সম্ভব গোদাবরী পৌঁছতে হবে। সেখানকার বরুণ-সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিতে হবে। কিন্তু তার আগে বিন্ধ্যাচলে যেতে হবে একটিবার। বিষ্ণুর সন্ধানে।

সূর্যের প্রথম কিরণ মুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে স্পর্শ করল মুখমণ্ডল। ঘুম ভেঙ্গে চোখ খুললো বিক্রম। দীর্ঘদিন পর বাড়ি এসেছে ও, গতকাল রাতে। পথশ্রমে ক্লান্ত, তার ওপর অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তখন। তাই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিল। রাতে খেয়াল করেনি, অভ্যাসবশে এই ঘরটিতেই এসে শুয়েছিল। ওর মা'র ঘর ছিল এটা। লেখাপড়ার ঘর, হাতের কাজের ঘর। এখন আর এই ঘরে কেউ আসে না। শয্যা ত্যাগ করে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো বিক্রম। নবীন সূর্যের কিরণ স্নান করিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিকে, জানালার বাইরে ঝলমল করছে একটা নতুন দিন। বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত ভূমি গৈরিক দিগন্ত স্পর্শ করেছে। সবুজ ঘাসে ছাওয়া উপত্যকায় রাশি রাশি হলুদ ফুল ফুটে রয়েছে। কাঠের মেঝেতে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো বিক্রম। বাবা লাঠিতে ভর দিয়ে আসছে দেখে এগিয়ে গেল।

'এত সকাল-সকাল উঠে পড়েছ?'— বাবার হাত ধরে বলল বিক্রম।

'আজকাল তো আর আমার ঘুম আসে না খোকা', — ধীরে ধীরে হেঁটে এসে শয্যার ওপর বসে পড়লেন ওর বৃদ্ধ বাবা, 'কিন্তু তুই বল, এতবার এই একই জানালায় দাঁড়িয়ে একই দৃশ্য দেখেছিস, এখনও মন ভরেনি?'

'হ্যাঁ, সেই ছোট্টবেলায় তোমার আর মা-র আঙ্গুল ধরে ঠিক এইখানটায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতাম। প্রতিদিন।'

বিক্রম দেখল, ওর বাবার মুখে যন্ত্রণার ছাপ। কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীরটা। পাশে বসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল বিক্রম।

'কী হয়েছে বাবা?'

'কী হয়েছে জানিস না?'— ভেউভেউ করে কেঁদে খেলল ওর বাবা, 'তোর মা মারা যাবার পর থেকে আমি এই বাড়িতে এক্কেবারে একলা। তুই মেতে আছিস দেশোদ্ধারে, বুড়ো বাবাটার কথা তো তোর মনেও পড়ে না।'

'বাবা, বাবা, শান্ত হও'— পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল বিক্রম, 'তুমি যদি বলো, আমি আর কোথাও যাব না। তোমার সঙ্গে সবসময় বসে থাকবো, এই এইখানে।'

'না খোকা, না। আমি কি জানি না, তোর ওপরে কী বিরাট দায়িত্ব রয়েছে? আমিই তো প্রথম তোকে আখড়ায় নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা কি ভুলে গিয়েছিস? তোর মতো আমিও তো বিষ্ণুপন্থার যাত্রী। তুই যে কাজটা করছিস, সেটা সমাজের জন্য কতটা জরুরি, সেটা আমি জানি খোকা। কিন্তু কী করি আমি, তোর মা মারা যাবার পর থেকে মনটা বড্ড দুর্বল হয়ে গেছে। তার ওপর যবে থেকে মহিষাসুর দেশের রাজা হয়েছে, সবসময় তোর জন্য চিন্তায় থাকি। তার ভয়ঙ্কর সব অত্যাচারের খবর যখন কানে আসে, তোর জন্য দুশ্চিন্তায় আমি মরে যাই। এই বুড়ো শরীর আর এই দুর্বল মনটাকে নিয়ে কী যে করি আমি... ও-ওকী! ওটা কিসের শব্দ?'

বাড়ির বাইরে গোলমালের আওয়াজে চমকে উঠল দুজনই। মনে হলো, অনেক লোক মিলে চিৎকার করছে। একবার তো মনে হলো, কেউ ওদের বাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়ছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে গেল বিক্রম, হাত চেপে ধরল ওর বাবা।

'যাস না, খোকা।'

'বাবা!' — হাত ছাড়িয়ে বলল বিক্রম, 'কী হয়েছে, একবার দেখতে তো দাও।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল বিক্রম। বাইরে কারা গোলমাল করছে? মহিষাসুরের লোকজনেরা গ্রাম আক্রমণ করেছে? আড়চোখে দেখে নিল বিক্রম, ঘরের এককোণে ওর আলখাল্লাটা পড়ে আছে। তার নীচেই রয়েছে ওর চিরসঙ্গী অস্ত্র, ওর পরশু। দ্রুত ভেবে নিল, যদি বাইরে কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, একলাফে ঘরে ঢুকে পরশুটা তুলে নেবে হাতে। পরশু সঙ্গে থাকলে পঞ্চাশজন মহিষ-সৈন্যও ওর সামনে টিকতে পারবে না।

দরজা খুলে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেল বিক্রম। মহিষাসুরের লোকজন নয়, গ্রামবাসীরা সবাই জড়ো হয়েছে ওর বাড়ির বাইরে। সবাই ওর অতি পরিচিত। গ্রামের কর্মকার, কুম্ভকার, বৈদ্য, কৃষক। এদের অনেকেই ওর ছোটবেলার বন্ধু। পাঠশালার সহপাঠী। ওই তো রক্তিম। ওর প্রিয় বন্ধু রক্তিম। কত অলস দুপুরে ফলপাকুড় পেড়ে গল্প করে কেটেছে ওদের দুজনের। কিন্তু আজ যে এদের কাউকেই চেনা যাচ্ছে না। প্রত্যেকের চোখে এক বিজাতীয় নিষ্ঠুরতা। অচেনা এক উন্মাদনা।

'খুনি!'— চিৎকার করে উঠল রক্তিম, 'শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।' সেই চিৎকারের সঙ্গেই একসঙ্গে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল গ্রামবাসীরা। 'আমাদের অনাথ করে দিল.... আমাদের অনাথ করে দিল...'— এই বলে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, মাথা ঠুকতে লাগল মাটিতে।

'অনাথ! খুনি! এসব কী বলছ?' চমকে উঠল বিক্রম।

'এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন কিছুই জানো না।'— বলল রক্তিম, 'কাল রাতে যে তুমি মোহিতখুড়োকে খুন করেছ, একথা অস্বীকার করতে চাও?'

গ্রামপ্রধান মোহিতখুড়ো!

'কী হয়েছে তার? এ কী বলছ তুমি?'— বলল বিক্রম, 'মোহিতখুড়ো খুন হয়েছে!'

একটা ইঁটের টুকরো এসে লাগল বিক্রমের কপালে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। ক্ষতস্থানে হাত চেপে ধরে বলল বিক্রম— 'আমি কেন মোহিতখুড়োকে খুন করতে যাব?'

'কারণ মোহিতখুড়ো তোমাদের দলবলকে পছন্দ করত না। তুমি গ্রামে আখড়া খোলার চেষ্টা করছিলে, এটা তো সবাই জানে। মোহিতখুড়ো বেঁচে থাকতে তোমাকে তা করতে দিত না। তাই তুমি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে?'

'একথা ঠিক নয়। মোহিতখুড়ো মোটেই বিষ্ণুপন্থার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু উনি কঠোর অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আমরা যে আখড়ায় অস্ত্রচর্চা করি, সেটা পছন্দ করতেন না। এটুকুই ছিল আমাদের বিরোধ। এজন্য কেন আমি তাঁকে খুন করতে যাব?'

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ। অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন বিচার তোমার হবেই।'

'বিচার? কে করবে আমার বিচার?'

'নতুন গ্রামপ্রধান।'

'সেটা কে?'

'আমি' — সগর্বে বলল রক্তিম।

একবার ভাবলো বিক্রম। হাতের কাছেই রয়েছে ওর পরশু। সেটা হাতে তুলে নিলে এইসব গ্রামবাসীরা এক মুহূর্তও ওর সামনে টিকতে পারবে না। পরমুহূর্তেই তাকিয়ে দেখল গ্রামবাসীদের মুখগুলোর দিকে। এরা তো সবাই ওর আপনজন। এদের মঙ্গলের জন্যই তো আজ ও বিষ্ণুপন্থার যাত্রী। এদের মেরে বেঁচে থেকে কী লাভ?

হাতদুটো মাথার ওপর তুলে উঠোন থেকে রাস্তায় নেমে এল বিক্রম। মুহূর্তে গ্রামবাসীরা ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে। সেখানে আগে থাকতেই মাটিতে পোঁতা ছিল লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ড। অসীম নিষ্ঠুরতায় সেটার সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল বিক্রমকে। তার চারপাশে

শুকনো ডালপালা জড়ো করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল গ্রামবাসীরা। দেখতে দেখতে দাউদাউ আগুনের শিখা গ্রাস করল বিক্রমকে। দুর্বার তাপস্রোত ছড়িয়ে পড়ল অঙ্গপ্রতঙ্গে। শরীর জুড়ে অসহ্য জ্বালা। মাংসপোড়া গন্ধ নাকে এল। অসহ্য যন্ত্রণায় বেঁকে গেল দেহটা। তারপরেই হঠাৎ করেই সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। বিক্রম দেখল, নবীন সূর্যের কিরণে সমগ্র উপত্যকা আলোয় ঝলমল করছে। আনন্দে চোখে জল এল ওর।

আমার দেশ!

অনন্ত জ্যোতিপুঞ্জে বিলীন হয়ে গেল বিক্রমের চেতনা। গ্রামবাসীরা দৌড়লো বিক্রমের বাড়িতে আগুন লাগাতে। দূর থেকে সব দেখল রক্তিম। বিক্রমের প্রিয় বন্ধু রক্তিম। বিচিত্র এক গোপন হাসি ওর ঠোঁটে।

মূর্খ গ্রামীণ সব লোক। যাক, মহিষাসুর খুব খুশি হবে।

হাট ভাঙতে আজ একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্ত শরীরটাকে টানতে টানতে আরুষ যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। দরজার কাছেই প্রতীক্ষা করছিল ওর মেয়ে ধারা। আরুষকে দেখেই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'বাবা! আজ তুমি বড্ড দেরি করেছ!'

'খুব ভুল হয়ে গেছে মা। কিন্তু দ্যাখ, তোর জন্য কী এনেছি।'

ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে আরুষ বার করে আনলো ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি একটি পুতুল। ধারার মুখে হাসি ফুটলো সেটা দেখে।

'পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল আরুষ।

'খুব সুন্দর'— পুতুলের মাথার সোনালিরঙা চটের দড়ির চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ধারা। ভেতর থেকে আরুষের স্ত্রী মেঘনা ডাক দিল, 'ধারা, তোমার বাবা সারাদিন খেটেখুটে এসেছেন, খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করতে দাও। তুমি বরং চিলেকোঠায় গিয়ে খেলো।'

'আচ্ছা মা', পুতুল হাতে চলে গেল ধারা।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রেখে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল আরুষ। আয়োজন সামান্যই। হাতে-গড়া গরম রুটি, ডাল। রুটির টুকরো ছিঁড়ে ডালে ডোবাতে যাবে, এমন সময় সদর দরজায় জোরে শব্দ হল। 'কে?' বলে চমকে উঠল আরুষ। হাত থেকে রুটি পড়ে গেল ডালের মধ্যে। আবার দরজায় ধাক্কার শব্দ ভেসে এল। এবার আরও জোরে।

'আমি দেখছি'— বলে মেঘনা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কপাট খুলতেই মেঘনাকে ঠেলে সরিয়ে জনাদশেক লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের সবার শরীরে বর্ম, মাথায় মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ। মুহূর্তে তারা বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আছড়ে ভাঙতে লাগলো জিনিসপত্র। মহিষাসুরের সৈন্য। ভয়ে গা হিম হয়ে গেল আরুষের। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। ইতিমধ্যে শোবার ঘরে যারা ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে একজন বেরিয়ে এল। হাতে তার একটা পুঁথি। সে পুঁথির কাঠের মলাট খুলতেই ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি ভূর্জপত্র। তাদের ওপর কাঠকয়লায় আঁকা নানান ছবি।

'মহিষাসুরের রাজত্বে এসব ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, সেটা জানো না?'— বলল সেই সৈন্য, 'এইসব দেবতার ছবি আঁকা যে কতবড় দণ্ডনীয় অপরাধ, সেটা কি তোমাকে আজ নতুন করে বলে দিতে হবে?'

'কিন্তু', ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদের চেষ্টা করল আরুষ, 'এগুলো তো আমার আগের আঁকা। এরমধ্যে অনেকগুলো তো আমার নিজের আঁকাও নয়, আমার বাবার আর ঠাকুর্দার আঁকা। আমরা যে বংশপরম্পরায় ভাস্কর। আমার তৈরি বেলেপাথরের সূর্যমূর্তি অনেক দামে বিক্রি হত হাটে, তীর্থযাত্রীরা কিনে নিয়ে যেত। এগুলো সেসব মূর্তিরই নকশা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে আর একটিও ছবি আঁকিনি আমি। একটিও মূর্তি গড়িনি। বাড়ির পেছনের জমিতে সবজি ফলাই, প্রতি হাটবারে তাই বিক্রি করে সংসার চলে।'

'মিথ্যে বলছো তুমি।'— হুঙ্কার দিল সৈন্য।

'না, বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি বলছি। গ্রামের যে কাউকে জিজ্ঞেস...'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না। অ্যাই, এটাকে গাড়িতে তোল।'

কয়েকজন সৈন্য মিলে চেপে ধরল আরুষকে। হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল দরজার দিকে। মেঘনা আহত বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। আরুষকে মুক্ত করার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করে দিল সৈন্যদের। মুহূর্তে আরও কয়েকজন সৈন্য এসে জাপ্টে ধরল মেঘনাকে। কাঁধের ওপর তুলে তাকে নিয়ে গেল বাড়ির বাইরে। সেখানে দাঁড়িয়েছিল একটা কাঠের খাঁচাগাড়ি, জোড়া মহিষে টানা। আরুষ ও মেঘনাকে তার মধ্যে ভরে দরজা আটকে দিল সৈন্যরা।

‘একটার বদলে দুটো’ — বলল এক সৈনিক, ‘পারিতোষিক আজ ভাগ্যে নাচছে।’

‘কচি বৌটার জন্য বেশি পারিতোষিক দাবি করা যাবে’— বলল আরেকজন সৈন্য, ‘আমাদের ক্ষত্রপ আবার কচি মেয়েদের একটু বেশিই পছন্দ করে।’

খাঁচাগাড়ি চলতে শুরু করল। মেঘনার বুকফাটা নিষ্ফল কান্না শুনে গ্রামবাসীরা নিজের নিজের বাড়ির জানালা দরজায় খিল দিয়ে ভেতরে লুকালো। চিলেকোঠার জানালা থেকে ওদের মেয়ে ধারা তাকিয়ে রইল বাবা-মা’র চলে যাওয়ার পথের দিকে। আতঙ্কে মূক, দু-হাতে আঁকড়ে রেখেছে ন্যাকড়ার তৈরি পুতুলটা।

জলের কলসী মাথায় নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে পথ চলছিল হৈম।

চারিদিকে উঁচু-নীচু লাল পাহাড়। মাঝখানে ধূলিধূসর উপত্যকা, বন্ধুর পথ। এবড়োখেবড়ো পাথর ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সাবধানে পথ চলতে হয়, পাছে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কলসীটাকে সাবধানে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল হৈম, যাতে ছলকে পড়ে একফোঁটা জলও নষ্ট না হয়। প্রায় তিনক্রোশ দূর থেকে জল বয়ে আনতে হয় প্রতিদিন। আগে তো মা-ই আনতো। আজকাল আর পারে না। জলের কলসী মাথায় ওঠালেই মেরুদণ্ডে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। নিরুপায় হয়েই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে হৈমকে এ দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হয়েছে।

সূর্য ধীরে ধীরে মধ্যগগনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারই সঙ্গে গরম বাড়ছে। বালি উড়ছে। আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে নিল হৈম। জলের বড় অভাব ওদের গ্রামে। অথচ ওদের গ্রাম সমুদ্রের ঠিক ধারেই। সমুদ্রের জল পান করা গেলে সব সমস্যাই তো মিটে যেত। আর সেটা তো অসম্ভব নয়। সমুদ্রের জল থেকে পানীয় জল বার করার একটা যন্ত্র বসিয়েছিল ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের লোকেরা। সূর্যের তাপে সমুদ্রের লোনা জল বাষ্পীভূত হতো, বায়ুশক্তিতে সেই বাষ্পীভূত জল সংগৃহীত ও ঘনীভূত হয়ে পানীয় জল হয়ে যেত। সারাদিনে যত জল পরিশ্রুত হত, তাতে দিব্যি চলে যেত গোটা গ্রামের। যে দুটো বছর যন্ত্রটা চলেছিল, গ্রামের চেহারাই বদলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর এল মহিষাসুর। তার দলবল এসে যন্ত্রটা ভেঙে দিল। ওরা বলেছিল, যন্ত্রটা নাকি অশুভ। সূর্যদেব ও পবনদেব নাকি যন্ত্রটার মাধ্যমে গ্রামের ওপর প্রভাব বিস্তার করছেন। তাই যন্ত্রটা ব্যবহার করা যাবে না।

যন্ত্রটা অশুভ। অশুভই বটে। মহিষাসুরকে তো আর তিনক্রোশ দূর থেকে জল আনতে হয় না।

পেছনে রাস্তায় একাধিক খুরের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালো হৈম। দেখল, বালি উড়িয়ে ধেয়ে আসছে মহিষ-আরোহী একদল সৈন্য। বাহনদের পিঠে স্তূপীকৃত সদ্য শিকার করা হরিণের দেহ। টপটপ রক্ত ঝরছে তাদের দেহ থেকে। বাহিনীর পুরোভাগে দলপতি, অপরিসীম ক্রূরতা মুখমণ্ডলে। ক্ষিপ্রগতিতে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো হৈম। দেখতে দেখতে এসে পড়ল লোকগুলো। গতি কমিয়ে হৈম যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই এসে দাঁড়াল। গায়ে জ্বালা-ধরা একটা কটূক্তি ভেসে এল হৈমর দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্য করে। ভয়ে সিঁটিয়ে পথ থেকে আরও দূরে সরে দাঁড়াল হৈম। হঠাৎই দলপতি দিক পরিবর্তন করে এগিয়ে এল ওর দিকে। লোকটার অভিসন্ধি বুঝতে দেরি হলো না হৈমর। কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল। দলপতির মহিষও দৌড়ল ওর পিছুপিছু। মহিষের খুরের নিচে চূর্ণ হলো মাটির কলসী। কষ্টে বয়ে আনা জলের প্রতিটি বিন্দু শুষে নিল তৃষিত মরুভূমি। বেড়াল যেমন করে খেলিয়ে ইঁদুর ধরে, তেমন করেই লোকটা হৈমকে তাড়া করে ধরে ফেলল। হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে নিল নিজের মহিষের পিঠে। প্রাণপণ যুদ্ধ করল হৈম, কিন্তু হেরে গেল শেষপর্যন্ত। দলপতি ওকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল নিহত হরিণগুলোর সঙ্গে।

চোখ ফেটে জল এল হৈমর। মা! ভাইটাকে দেখো। এখনও বড্ড বাচ্চা ও। হে সূর্যদেব। কী হবে ওদের? কে এখন ওদের জল এনে দেবে? জলের অভাবে কি ওরা মারা যাবে? তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মারা যাবে আমার মা, আমার ভাইটা?

অনতিদূরের লাল পাহাড় থেকে শোনা গেল ক্ষীণ এক শঙ্খধ্বনি। মহিষ-সৈন্যরা তা খেয়ালও করল না। পথের ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলল তাদের মদগর্বী যুথ। শিকারে বধ হওয়া জন্তুগুলোর সঙ্গে মহিষের পিঠে পড়ে রইল রক্তে মাখামাখি হৈমর নির্জীব দেহটা। দীর্ঘ এক অপমান ও যন্ত্রণার জীবনের প্রতীক্ষা। দু-ক্রোশ দূরে উন্মুক্ত উপত্যকা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে সংকীর্ণ এক গিরিবর্ত্মে। সেখানে ঢোকার মুখে আরেকবার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। এবার সে শব্দ এল খুব কাছ থেকেই। দলপতি সৈন্যদের বলল, ‘সাবধান! গিরিবর্তের মাথার দিকে নজর রেখে চল। খেয়াল রাখ, ওপর থেকে কেউ তির ছুঁড়ছে কিনা।’

সৈন্যরা সবাই পাহাড়ের মাথায় দৃষ্টি আবদ্ধ করে ধীরে

ধীরে গিরিবর্ত্মের সংকীর্ণ পথ বেয়ে এগোতে লাগল। প্রায় এক ক্রোশ চলার পর হঠাৎই মহিষগুলো পরিত্রাহি চিৎকার করে লাফাতে শুরু করল। কয়েকজন সৈন্য মহিষের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল মাটিতে। পড়েই তারাও আর্তনাদ করে উঠল। দলপতি মাটিতে নেমে দেখল, রাস্তায় অসংখ্য বাবলা গাছের কাঁটা পড়ে আছে। সর্বনাশ! পথ জুড়ে কে ছড়ালো এত কাঁটা?

'এই, এগুলো সব পরিষ্কার কর।'— হুকুম দিল দলপতি।

পরিষ্কার করবে, তারজন্য তো সম্মার্জনী প্রয়োজন। এখানে তা কোথায় পাবে? কিন্তু সেকথা দলপতিকে কে বলবে? বাধ্য হয়ে মহিষগুলোর পিঠ থেকে কম্বলের আসন খুলে নিয়ে সেগুলো দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে শুরু করল সৈন্যরা। ঠিক এইসময় পাহাড়ের ওপর থেকে আবার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। তার সঙ্গেই গুরুগুরু শব্দে ছোট বড় অসংখ্য পাথরের টুকরো গড়িয়ে নামতে শুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে। ধুলোর ঝড় উঠল বাতাসে। আশপাশে কী আছে কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। পাথর-বৃষ্টিতে ভয় পেয়ে আরোহীবিহীন মহিষগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়তে শুরু করল। তাদের খুরের তলায় পিষ্ট হল কয়েকজন সৈন্য, বাকিরা ভয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়াল। খানিকক্ষণ পর ধুলোর ঝড় স্থিতু হল। দলপতি দেখলো, তিনটি বালক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। করোর বয়সই দশ বছরের বেশি হবে না। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি, যাকে একটু আগে পথ থেকে অপহরণ করা হয়েছিল। কে খুলে দিল মেয়েটার বাঁধন? এই বাচ্চা ছেলেগুলো? এরা কারা?

'কে তোরা?' — হুঙ্কার দিল দলপতি।

'আমরা বিষ্ণু'— বলল ওদেরই মধ্যে একটি বালক।

'বিষ্ণু? হা-হা-হা... এইটুকু বিষ্ণু? ঠিক আছে, আজ তবে খুদে বিষ্ণুদের দিয়েই জলপান করা যাক। আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে পালানোর মতলব করেছিস...'

ছেলেটির ডানহাত এতক্ষণ তার শরীরের পেছনে লুকানো ছিল। যেন দলপতির কথার জবাব দিতেই বালকটি হাত বার করে আনল। দেখা গেল, সেই হাতে ধরা আছে ক্ষুদ্র একটি গদা। গদার আয়তন দেখে হা-হা করে হেসে উঠল দলপতি। সে অট্টহাসি শেষ হওয়ার আগেই গদাটি মরুৎবেগে উড়ে এসে দলপতির কপালে আঘাত করল। মুহূর্তে আঁধার নেমে এল দলপতির চোখে।

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road

Ram Nagar, New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232 **Cont : 9811044543**

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in **Fax : 91-11-23636380**

A
Since 1948

Ahuja

Tailors & Drapers (Regd.)

5/54, Ajmal Khan Road, Karol Bagh,

New Delhi-110 005

☎ Shop : 25764007, 41450181,

Fax : 25738096

e-mail : tailorindia@gmail.com

With Best Compliments from -

Damiyaas Enterprises

(Banwari Lal Watch Co.)

*** Watches - TISSOT, CASIO**

*** Gold and Diamond Jewellery**

*** Gems**

1, Ambedkar Road

Ghaziabad - 201 001 (U.P.)

Mobile : 9871835848, 9213789652

পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা দুদণ্ডের মধ্যেই নিকটবর্তী স্কন্ধাবার থেকে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে অকুস্থলে ফিরে এল। এসে দেখল, গুটিকয় রুধিরাক্ত সৈন্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মাঝে দলপতির প্রাণহীন দেহটি পড়ে আছে। শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, শুধু কপালের মধ্যিখানে রয়েছে একটি কালশিটের দাগ। অদ্ভুত আকৃতি সেই দাগের। যেন কেউ নিখুঁতভাবে একটি চক্র এঁকে দিয়েছে দলপতির কপালের ঠিক মাঝখানে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টপটপ করে জল পড়ছে গুহার ছাদ থেকে। অসীম নৈঃশব্দ্যের মাঝে সেই ক্ষীণ শব্দই কানে বড় বাজছে। ভ্যাপসা কটু গন্ধ বাতাসে। গুহার বাইরে নিশ্চয়ই এখন সুগন্ধী মৃদুমন্দ মলয়বায়ু বইছে। কিন্তু আলো-বাতাসহীন এই গুহার বাতাসে রয়েছে শুধু পচা শ্যাওলা ও চামচিকের বিষ্ঠার গন্ধ। ধীরে ধীরে চোখ খুলল হরি।

চোখবন্ধ অবস্থায় যতটা অন্ধ ছিলাম, চোখ খোলার পরেও ততটাই তো অন্ধ রয়েছি। সত্যিই কি চোখ খুলেছি আমি?

কয়েক মুহূর্ত সময় নিল হরি, চোখদুটোকে অন্ধকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। কোনো তফাত হল কি? কিচ্ছু না। নিজের হাতজোড়ার দিকে তাকালো। কোথায় গেল হাতদুটো? অনুভব করা যাচ্ছে ওদুটো আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। আমার শরীরটা গেল কোথায়? দম বন্ধ হয়ে আসছে। কেউ কি আমার গলা টিপে ধরেছে? আমার কি আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে? দীর্ঘশ্বাস ফেলল হরি। এত বছর পরেও অন্ধকার আমার রপ্ত হলো না। কিন্তু এসব ভাবনার সময় নেই। ওরা আসছে। ধ্যানাসন থেকে উঠে দাঁড়াল হরি। পদদ্বয় মাটিতে দৃঢ়প্রোথিত করে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল ঊর্ধ্বমুখে, ব্রহ্মাণ্ড থেকে ইঙ্গিত গ্রহণের আশায়। ভ্রূযুগলের মধ্যে সম্পূর্ণ চেতনাকে সংহত করল ও। মনে মনে নিজেকে বলল, চোখ ছাড়াও দেখতে পাই আমি। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল অত্যন্ত ধীরগতিতে। হঠাৎ পায়ের তলায় মৃদু কম্পন অনুভব করল হরি। সংবেদী কানদুটোতে ধরা পড়ল কাপড়ের ক্ষীণ খস্‌খস্‌ শব্দ। এর পরের ঘটনাগুলো একসারি দুঃস্বপ্নের মতো একটার পর একটা ঘাড়ে এসে পড়তে লাগল। প্রথমেই হরি অনুভব করল, কেউ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর ওপর। অন্তিম মুহূর্তে ডান পা তুলে আগতপ্রায় প্রহারকে রুখে দিল। ধপ্‌ করে শব্দ হলো। আর্তনাদ বলে দিল, একজনের পতন হয়েছে। কিন্তু খুশি হওয়ার সময় নেই। আরও অনেকে আসছে। ঘিরে ধরছে চারদিক থেকে। নিখুঁত লক্ষ্যে পা-দুটোকে চক্রাকারে ঘোরাতে শুরু করল হরি। প্রচণ্ডগতিতে ঘূর্ণায়মান পা-দুটো ওর চারপাশে সুরক্ষার এক অভেদ্য বলয় তৈরি করল। যে কেউই সে বলয় ভেদ করার চেষ্টা করল, বিধ্বংসী আঘাতে ছিটকে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে হরির চারপাশে পড়ে রইল শুধু একরাশ অচেতন দেহ। চারিদিকের হইচই হঠাৎ করে যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। আবার শান্ত নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল গুহার অন্তর। হরি আবার ধ্যানাসনে বসে পড়ল। চোখদুটো বন্ধ করল।

সত্যিই কি চোখ বুজলাম? আগেও যেমন অন্ধকার ছিল, এখনও তো তেমনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সত্যি, অন্ধকার আমার আজও সহ্য হলো না।

নিঃশ্বাস দ্রুতলয় থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল। এমন সময় শুনতে পেল, অনেকদূর থেকে কেউ চিৎকার করছে 'হো-ও-ও-ও....।'

'হো-ও-ও-ও....' উত্তর দিল হরি। বন্ধ চোখে অনুভব করল, ক্ষীণ এক আলোকরশ্মি এসে পড়েছে গুহার মধ্যে। ধীরে ধীরে চোখ খুলল। দেখল, সন্তর্পণে সাবধান পদক্ষেপে অচিন্ত্য গুহার মধ্যে ঢুকছে। গুহার ভেতরের দৃশ্য দেখে আর্তনাদ করে উঠল সে।

'তুমি আবার সবাইকে ঘায়েল করে ছেড়েছ?'

'এই অভ্যাসবর্গের সেটাই তো উদ্দেশ্য, তাই না?'— বলল হরি। গলায় ক্ষীণ দুঃখের আভাস।

'ই-হো-ও-ও-ও...'। চিৎকার করল অচিন্ত্য। সেই ডাক শুনে ভীমাকৃতি কয়েকজন লোক গুহার মধ্যে এসে ঢুকল।

'ভাইসব'— বলল অচিন্ত্য, 'এই বেচারাদের কিছু একটা ব্যবস্থা কর। বৈদ্যর কাছে নিয়ে যাও এদের।'

হরির দিকে ফিরে অচিন্ত্য বলল, 'যদি জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নিতে চাও, নিতে পারো। এর পরের অভ্যাস তৈরি আছে তোমার জন্য।'

'সেটা যেন কোনটা?' প্রশ্ন হরির।

'অচক্ষু'— বলল অচিন্ত্য।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরি উঠে দাঁড়ালো। মুক্ত গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সুবাসিত বাতাসের চনমনে ঝাপটা স্বাগত জানাল। ঝলমলে আলো চোখদুটোকে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে ঝাপসা আলো ঝিমিয়ে পড়ল, দৃশ্যপট

পরিষ্কার হল। হরি দেখল, চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজের স্রোত পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে নেমেছে অনেক নীচু পর্যন্ত। যেখানে সে ঢাল মাটি স্পর্শ করেছে, সেখানে নারিকেল গাছের সারি দু-হাত বাড়িয়ে দুই দিগন্ত স্পর্শ করে পাহাড়ের সীমানা রচনা করেছে। সেই সীমানার পর শুরু হয়েছে ধানক্ষেতের রাজত্ব। যেদিকে দুচোখ যায়, শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। বর্ষার জল জমেছে তাদের গর্ভে। কচি ধানের শীষ কৌতূহলী মাথা তুলেছে জলের ওপর। অগভীর জলতল ছিলমিল করছে সূর্যের আলোয়। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল হরি। পাহাড়ের এই ঢাল বেয়ে মশল্লার চাষ হয়, বাতাসে তাই হরেক রকমের মশল্লার গন্ধ। সমুদ্রের লোনা সুবাস রবাহুত হয়ে এসে মিশেছে সেই গন্ধে। পাহাড়ের ওপারেই তো রয়েছে সমুদ্র। সিন্ধুসাগর।

গুহামুখের বাইরে কিছুটা সমতল ঘাসজমি, তার ওপরে দাঁড়িয়ে হরি। ওর থেকে কিছুটা দূরে গুহার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পনেরোজন বলিষ্ঠদেহী যোদ্ধা। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এল হরির দিকে।

'প্রণাম হরি'। করজোড়ে বলল সে।

'প্রণাম বক্রুণি', বলল হরি।

'আসুন, বেঁধে দিই,' বলল বক্রুণি।

'ধন্যবাদ'— বলে চোখ বুজল হরি, ঠোঁটের কোণায় প্রচ্ছন্ন ভীতি। একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসবস্ত্র দিয়ে হরির চোখ দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিল বক্রুণি, তারপর ধীরে ধীরে গুহার দেওয়ালের দিকে পিছিয়ে বাকি চোদ্দজনের সঙ্গে যোগ দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হরি। এবার আমিই শুধু অন্ধকারে। আমার শত্রুরা রয়েছে আলোকে।

আগের মতোই আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হরি। ব্রহ্মাণ্ড থেকে ইঙ্গিত গ্রহণের আশায়। আসন্ন আক্রমণের ইঙ্গিত। পনেরোজন মিলে ঘিরে ধরল ওকে।

অস্থির দেখাচ্ছিল যুধাকে।

সিংহের মতো সবল শরীরের গড়ন। সেই শরীর এখন ঘামে ভিজে চুপচুপে। ভিজে জামাকাপড়। উষাকাল থেকে তিন ঘণ্টা কঠোর সমরানুশীলন শেষে সবে ফিরে এসেছেন নিজের ঘরে। একশো বছর বয়স হল যুধার, কিন্তু আজও শারীরিক সক্ষমতা একটুও কমেনি। একটু পরেই কর্মব্যস্ত দিন শুরু হবে। দফায় দফায় প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শসভা, নবীন সংগঠকদের জন্য বৈচারিক বর্গ, সংগঠনের হাজারও নৈমিত্তিক কাজ। তার আগে এখন একটু বিশ্রাম নেবার সময়। কিন্তু আজ শরীর বিশ্রাম চাইলেও মন চঞ্চল। সে মন বলছে, চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মানবসভ্যতা। নির্ণায়ক মুহূর্ত সামনেই।

ভীষণ ঝড় উঠেছে বাইরে। তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কাঠের ছাদের ওপর জলের ফোঁটার অবিরাম চড়বড় চড়বড় আওয়াজে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। তারই মধ্যে শুনতে পেলেন দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ। যুধার দরজা সবসময়েই উন্মুক্ত থাকে সবার জন্য, তাই করাঘাতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা যুধার বিশ্রামের সময়। বোধহয় করাঘাত সেইজন্য। কে এল এই সময়? নিশ্চয়ই নহুক।

'এস নহুক, আমি জেগেই রয়েছি'— বললেন যুধা।

গুটি গুটি ঘরে ঢুকল নহুক। মঠের প্রধান ব্যবস্থাপক। ছোট্টখাটো গোলগাল মানুষ। দেখলে বোঝার উপায় নেই, কী অপরিসীম ক্ষমতা এই লোকটির। কী অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে মানুষটা এতবড় মঠটিকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করেন। কেউ কখনো টেরও পায় না।

'আজ তুমি বিশ্রাম নাওনি যুধা?'— প্রশ্ন নহুকের।

'ওকথা ছাড়ো। এমন অসময়ে তোমার দর্শনলাভ কেন হলো সেটা বলো।'

'হরি আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছল।'

'এত তাড়াতাড়ি? গতকালই তো ও মলয়পর্বতে শিক্ষাবর্গে ছিল। সেখান থেকে এখানে এই বিন্ধ্যপর্বতে...'

'কী জানি! যাই হোক, তুমি বলেছিলেন ও এলেই ওকে তোমার কাছে পাঠাতে।'

'হ্যাঁ মনে আছে। তা, ওকে কি একটু বিশ্রাম করতে দিয়েছ? অতদূর থেকে আসছে। জল-টল দিয়েছ তো?'

'সেসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ও এখনও বিশ্রামকক্ষেই রয়েছে। এখন বলো, কখন ওকে তোমার কাছে পাঠাবো?'

'জিজ্ঞেস করো, ওর যদি বিশ্রাম হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এখনি আসতে পারে।'

'সেকি! তুমি কি একটুও বিশ্রাম নেবে না আজ?'

'না হে বন্ধু, আজ আর বিশ্রাম হবে না। দেখছ না, বাইরে কীরকম ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে? প্রলয় আসছে। তার আগে অনেক কাজ শেষ করতে হবে। যাও, নিয়ে এস ওকে।'

'যেমন তোমার ইচ্ছে। নিজের বয়সের খেয়ালটা শুধু রেখো। শরীর খারাপ হলে সেই আমাকেই তো সামলাতে হবে।'

'সখা, তুমি আমাদের বিপত্তারণ। কিন্তু এখন শরীরের

যত্নের সময় নয়, কাজের সময়। নিয়ে এস ওকে। ঝড় আসছে ...। যেমন গুটি গুটি নিঃশব্দ পায়ে এসেছিল মানুষটি। তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। ভাবতে ভাবতে গেল, নৃসিংহের কি মস্তিষ্কবিকৃতি হচ্ছে? ভীমরতী হয় জীবনের সাতাত্তর বর্ষ সপ্তম মাস সপ্তম দিনে। সে দিনটি তো সখা কবেই পার করে এসেছে। উপরন্তু কাজের চাপ এত বেড়ে গেছে, মস্তিষ্কের আর দোষ কী! সখার এখন অবসর নেওয়া উচিত।

'আসতে পারি?' দরজায় ধাক্কা দিল হরি।

'এসো, এসো হরি।' বলল যুধা।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো হরি। দেখল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকায় এক পুরুষ। সিংহের মতো সবল শরীর, তাম্রবর্ণ। বৃহৎ রক্তবর্ণ বর্তুলাকৃতি অক্ষিদ্বয়। স্ফীত নাসিকা, তীক্ষ্ণ দন্ত। কুঞ্চিত এলোমেলো শ্বেতশুভ্র কেশদাম সিংহের কেশরের মতো ঘিরে রয়েছে গোলাকৃতি মুখমণ্ডলকে। পাশবিক গড়নের সেই মুখমণ্ডলে মহাজাগতিক প্রশান্তি ও শিশুর সারল্যের সঙ্গে মিশে আছে অনমনীয় এক দৃঢ়তা। যেসব ভয়ঙ্কর উপকথা জম্বুদ্বীপের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে ওঁর সম্বন্ধে, সেসব কি সত্যি? সত্যিই কি উনি খালি হাতে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন? কে জানে। একবার লোভ হলো, কথাটা জিজ্ঞেস করি। নিরস্ত হল লজ্জায়। একটা কথা অনস্বীকার্য। লোকে ওঁকে নৃসিংহদেব বলে, সেটা অতিরঞ্জিত নয়।

'প্রণাম' —বলল হরি।

'প্রণাম' বললেন যুধা— 'বসো। যাত্রাপথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

'না যুধা, মহাশক্তির কৃপায় কোনো কষ্ট হয়নি।'

'প্রথমে তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি, কেমন? বলো হরি, এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ কী?'

'এই ব্রহ্মাণ্ড এক স্বপ্নমাত্র। স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন মহাশক্তি। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, সীমা নেই। তাঁর প্রকৃত মূর্তি নেই, তবু এই ব্রহ্মাণ্ডের সব রূপ-রস-গন্ধে শুধু তিনিই রয়েছেন। তিনি সজীব, আত্ম-সচেতন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যে তিনি নিজেকেই বারেবারে পুনরাবিষ্কার করেন।'

'সুন্দর ব্যাখ্যা করেছ। এবার বলো, মানবজীবনের পরম পাওয়া কী?'

'মহাশক্তির স্বরূপকে উপলব্ধি করা, নিজেকে অনন্ত মহাশক্তির অঙ্গ হিসেবে উপলব্ধি করা।'

'এবার বলো, আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য কী?'

'মানবসমাজকে সংগঠিত করা।'

'কার বিরুদ্ধে সংগঠিত করা?'

'কারোর বিরুদ্ধে নয়, সুস্থ শরীরের অর্থ— তার সবকটি কোষ, সবকটি অঙ্গপ্রতঙ্গ পরস্পর সঠিক সমন্বয়ে রয়েছে। তেমনি সুস্থ সমাজের লক্ষণ তার সমাজবদ্ধতা, তার সমন্বয়, তার সংগঠনত্ব।'

'তুমি বললে, মহাশক্তির স্বরূপকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের পরম পাওয়া। কিন্তু আমরা তো সারাজীবন ব্যস্ত থাকি মানবসমাজকে সংগঠিত করতে। সেটা করে কি আমরা সময় নষ্ট করছি না? সংগঠনের পেছনে সময় নষ্ট না করে জীবনের এইসব অমূল্য সময় কি মহাশক্তির স্বরূপকে উপলব্ধি করতে ব্যয় করা উচিত নয়?'

'বস্তুত, সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে আমরা মহাশক্তির স্বরূপকেই উপলব্ধি করছি।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'সমুদ্রও জল, একঘটি জলও জল। ঘটির জল সমুদ্রের স্বরূপ উপলব্ধি করায় না। কিন্তু বিশাল এক নদী সমুদ্রের স্বরূপকে উপলব্ধি করায়। আমাদের সকলের সমষ্টিই মহাশক্তি। যখন আমরা সংগঠিত হই, সেই সংগঠিত রূপ মহাশক্তিরই স্বরূপ উপলব্ধি করায়। আজকের মানবসমাজ চূর্ণবিচূর্ণ আয়নার ন্যায় প্রতীত। তারা বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি-ভিত্তিক পৃথক পৃথক সমাজ রচনা করেছে। একে অপরের সঙ্গে সহমর্মিতা রাখে না তারা। অগ্নি-উপাসনা ও বায়ু-উপাসনা যে বস্তুত একই মহাশক্তির উপাসনা, সে বোধ তাদের নেই। এই শতধাবিভক্ত সমাজকে এক সমাজ হিসাবে গড়ে তোলাই বিষ্ণুর উদ্দেশ্য।'

'অসুররাও তো একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে, তাই না? তারাও তো চায় শতধাবিভক্ত এই সমাজকে এক সমাজ হিসাবে গড়ে তুলতে। তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ কোথায়?'

'আপাত মিল থাকলেও তাদের আর আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। অসুররা চায়, মানবসভ্যতা তার যাবতীয় পূর্ব-উপলব্ধি ভুলে গিয়ে সবাই একরকম হয়ে যাক। একই উপাসনাপদ্ধতি হোক, একইরকম পোশাক হোক, একই ভাষা ও খাদ্যাভ্যাস হোক। টুকরো টুকরো সমাজগুলির যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে সবাইকে নতুন এক ধাঁচে গড়ে তুলতে চায় অসুররা। আমরা চাই প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ তাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে লালনপালন করুক, সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গৌরব অনুভব করুক। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য যেন সংঘাতের কারণ

হয়ে না দাঁড়ায়। সবার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গে নিয়েই তাদের একত্রিত করে এক বৃহত্তর সমাজের নির্মাণ করতে চাই আমরা। অসুররা চায় কাননের সব বৃক্ষ ধ্বংস করে সেখনে একই বৃক্ষের অসংখ্য চারা রোপণ করতে। আমরা চাই এমন কাননের নির্মাণ করতে, যেখানে প্রতিটি বৃক্ষ আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য, অথচ কেউ কারোর বিরোধী নয়, সবাই সকলের সহযোগী।'

'আমাদের সংগঠনে মনুষ্যনির্মাণের ভূমিকা কী?'

'খুনে লুঠেরাদের দলও সংগঠন। সে সংগঠন অনিষ্টকারী, কারণ তার উপাদান খারাপ। ঘুণধরা কাঠ দিয়ে মজবুত ইমারত তৈরি করা যায় না। সমাজ-সংগঠনও তখনই মহাশক্তির স্বরূপ হয়ে ওঠে, যখন তার উপাদান প্রতিটি মানুষ ভালো হয়। সংগঠিত সমাজের স্বার্থেই সমাজের প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রয়োজন।'

'সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলতে কী বোঝায়?'

'শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আত্মিক বিকাশ। কোনোটা কম, কোনোটা বেশি হলে চলবে না। এই চারের সুষম বিকাশই মনুষ্যত্ব।'

'কিন্তু সে দায়িত্ব তো মাতাপিতা ও শিক্ষকের, তাই না? আমরা তাহলে মনুষ্যনির্মাণ নিয়ে মাথা ঘামাই কেন?'

'মাতাপিতা ও শিক্ষক যদি সে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম না হন, তাহলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে। কারণ, সমাজ রক্ষা আমাদেরই দায়িত্ব।'

'ঠিক বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো। মাতাপিতা ও শিক্ষকের প্রচেষ্টা কেন যথেষ্ট নয়?'

'পাহাড় কেটে ভব্য সুরম্য মন্দির তৈরি করতে বছরের পর বছর লেগে যায়। তার চেয়েও বেশি ধৈর্য ও সময় লাগে একটি শিশুকে এক আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে। কিন্তু সব মাতাপিতা বা শিক্ষকের সেই ধৈর্য ও সুযোগ থাকে না। তাই আমাদের কাজ আমাদের করে যাওয়া প্রয়োজন।'

'সংগঠকদের কেন নিরন্তর নিত্যনতুন গুণ অর্জন করে যাওয়া উচিত।'

'সংগঠকদের সবদিক থেকে সমাজের সামনে আদর্শ হতে হবে। আমরা যদি শ্রেষ্ঠতম গুণের অধিকারী না হই, লোকে আমাদের কথায় গুরুত্ব দেবে কেন?'

'এখানে জ্ঞানের ভূমিকা কী?'

'জ্ঞান এমন এক শক্তি যা বিদ্যা, অবিদ্যা ও অপবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞানই শস্ত্র। তাই আমাদের উচিত নিরন্তর নানান উৎস থেকে জ্ঞানার্জন করে যাওয়া।'

'কী ধরনের মানবসমাজের স্বপ্ন আমরা দেখি?'

'এমন সমাজ, যেখানে প্রতিটি শিশু সমান সুযোগ পায়, কারোর সঙ্গে কোনো ভেদভাব না হয়। এমন সমাজ, যেখানে নেতৃত্ব রয়েছে, কিন্তু শাসক নেই। যেখানে সবাই সমাজ থেকে প্রয়োজনমতো গ্রহণ করে, সমাজকে সাধ্যমতো ফিরিয়ে দেয়। সবাই নিজেকে মহাশক্তির অংশ হিসেবে উপলব্ধি করে। যেখানে কোনো শিশু অনাথ নয়। কারণ, প্রতিটি অনাথ শিশুই আনন্দের সঙ্গ প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় পায়। এমন সমাজ, যেখানে সবাই সবার দায়িত্ব নিয়েছে। যেখানে কোনো দমন-পীড়ন নেই, সবাই প্রতিটি কর্তব্য আপন ইচ্ছাতে আনন্দের সঙ্গে পালন করে।'

'তোমার প্রতিটি উত্তরেই আমি খুশি। হরি, তুমি গত ত্রিশ বছর ধরে আমাদের সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক। আমাদের দশটি শিক্ষণস্তরের সবকটিই তুমি সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছে। সংগঠনের তরফ থেকে তোমাকে যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তুমি সবই সুষ্ঠুভাবে পালন করেছ। অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিপদ ঘটিয়েছ, আবার সেই মৌলিক বুদ্ধির জোরেই অনেক জটিল সমস্যার সমাধানও করেছ। তুমি উৎসাহী, সংগঠনের কাজকে তুমি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছ। তোমার প্রান্তের শাসক আমাদের ঘোরতর বিরোধী, তবুও তুমি কখনো ভীত বা হতোৎসাহ হওনি। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলা, সবাইকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তোমার রয়েছে। এবার তোমাকে বলি, কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমাকে উত্তরক্ষেত্রের সংগঠকের দায়িত্ব দিতে চাই। যদি তুমি সম্মত থাকো। আমার মনে হয়, এ দায়িত্ব তুমি সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবে।'

উত্তরক্ষেত্র! বুক দুরুদুরু করে উঠল হরির। মহিষাসুরের এলাকা। বিষ্ণুর ঘোরতর বিরোধী মহিষাসুর। গত দশ বছরে চারজন ক্ষেত্রীয় সংগঠক খুন হয়েছেন উত্তরক্ষেত্রে। হরির মুখমণ্ডলের ক্ষণিক শিথিলতা যুধার চোখ এড়িয়ে গেল না।

'জানি, কঠিন এ দায়িত্ব'— বলল যুধা, 'এর থেকেই বুঝতে পারছো, তোমার ওপর কতটা ভরসা আমার। কিন্তু তুমি চাইলে এ দায়িত্ব না নিতেই পারো। প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি তোমাকে। তাই এ সিদ্ধান্ত আমি তোমার উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। সবদিক ভেবেচিন্তে তোমাকেই ঠিক করতে হবে, এ দায়িত্ব নেবে কিনা।'

'না, না। এ কী বলছেন!'— বলল হরি, 'আমি খুশি মনে এ দায়িত্ব স্বীকার করছি। শুধু ভাবছিলাম, বড্ড ঠাণ্ডা সেখানে। আমি মলয়াদ্রির মানুষ, গরমে অভ্যস্ত। সেখানে তো আবার গরম বলে কোনো বস্তুই নেই।' এই বলে হেসে ফেলল হরি।

ঝড়বৃষ্টিতে ধোয়া পরিষ্কার আকাশে সূর্য অস্ত গেছে। ঘন আকাশি রঙের একখানা মস্ত কাপড় জুড়ে ফুটেছে অগুণতি তারার ফুল। আকাশ জুড়ে উড়ছে সে বেপরোয়া কাপড়খানা। তাকে ফুঁড়ে ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছে পূর্ণচন্দ্রের। জ্যোৎস্নার ফিনকি ফুটছে বিন্ধ্যাচলে। বাতাস বইছে মন্দ মন্দ। তাতে উড়ছে দুই সংগঠকের বসনপ্রান্ত। দুই বিষ্ণুর বসনপ্রান্ত।

'তোমার বাহন কই?'— প্রশ্ন যুধার।

'জঙ্গলের মধ্যে'— বলল হরি।

'সেকি! মঠের ঘোড়াশালে রাখোনি কেন?'

'আমার বাহনটি একটু বন্য প্রকৃতির। ঘোড়াশালে রাখার উপযুক্ত নয়। আপনি চিন্তা করবেন না। সে বুনোটা জঙ্গলেই ভালো থাকে। এবার আমাকে অনুমতি দিন।'

'সাবধানে থেকো। তোমার ওপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত রইল।'

'সে আমি জানি, যুধা। নিশিন্ত থাকুন।'

'যাত্রা শুভ হোক। মহাশক্তি তোমাকে রক্ষা করুন।'

পদব্রজে দূরবর্তী ঘন জঙ্গলের উদ্দেশে যাত্রা করল হরি। সে যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইল যুধা। মন ভারাক্রান্ত। বিগত সত্তর বছর ধরে যেসব সংগঠকদের তিলে তিলে গড়ে তুলেছে এই সংগঠন, একে একে তাদের বিদায় দিতে হচ্ছে। মন বলছে, প্রলয় আসতে চলেছে। সেই প্রলয়শেষে এদের মধ্যে কতজন বেঁচে থাকবে, তা মহাকালই জানেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মঠের দিকে এগোলো যুধা। কিছুটা এগোনোর পর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাতির পায়ে চলার রাস্তা শুরু হয়েছে। সেই রাস্তায় অর্ধপ্রহর চলার পর একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো হরি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর ক্ষীপ্রগতিতে নিকটবর্তী মহীরুহে চড়তে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল মগডালে। সেখান থেকে ফেলে আসা পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করল। দেখল, পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে মঠ। খুশি হয়ে ঠোঁট সূচালো করে শিসের মতো আওয়াজ করল। কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। হঠাৎ করেই অকালে আঁধার নেমে এল আকাশে। পূর্ণচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে বিশাল একপ্রাগৈতিহাসিক পক্ষী নেমে এল গাছের ওপর। সে পক্ষীর গুরুভারে বেঁকে গেল পাদপের অতিকায় কাণ্ড। হরি লাফিয়ে চড়ে বসল পক্ষীর প্রশস্ত পিঠে। পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিল ইস্পাতকঠিন তার পালকসম্ভারের ওপর। মহাপক্ষীর গলা দিয়ে অদূরে কঁ-কঁ এক ধ্বনি নির্গত হল।

জঙ্গলের উপরিতলে ঝড় তুলে হরিকে পিঠে নিয়ে গরুড় উড়লো আকাশে। উত্তরদিকে, হিমালয়ের উদ্দেশে।

হিমালয়ের পাদদেশে শান্ত জনপদ দ্বারব্রহ্মা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিরাম, অসংখ্য সুরম্য উদ্যানে সুসজ্জিত এক নগরী। ব্রহ্মারাজ্যের শুল্কদপ্তরকে কেন্দ্র করে সহস্রাধিক পরিবারের বসবাস গড়ে উঠেছে এখানে। শুল্কদপ্তরটি বেশ বড়, দ্বিতল। বাকি বাড়িগুলো সবই একতলা। গঙ্গার পাড়ে বিরাট ঘাট। যে কোনো সময় অর্ধশতাধিক নৌকা বাঁধা থাকে এখানে। এছাড়া থাকে ব্রহ্মা-নৌসেনার দুটি রণতরী ও পনেরোটি ছিপনৌকা। ক'বছর আগেও অসংখ্য বাণিজ্যপোত প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যাতায়াত করত। এখন তার এক-চতুর্থাংশও দেখা যায় না। জনপদ তাই যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে।

শুল্কগৃহের চন্দ্রকক্ষ থেকে গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন সামন্ত গৌর, দ্বারব্রহ্মার মহানাগরিক। একরাশ চিন্তা আজ তাঁর মনে। ব্রহ্মার মতো সমৃদ্ধ রাজ্যের সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব সহজ নয়। বিশেষত, যদি সে রাজ্যের প্রভু রাজ্যরক্ষার বিষয়ে উদাসীন হন। এই নিয়ে তৃতীয়বার গোপন ডাকে মহারাজ অমিতবলকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। কোনোটিরই উত্তর আসেনি। একজন রাজা কী করে রাজ্যশাসনে এত উদাসীন হতে পারেন? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গৌর। যদি আজ মহারাজ মহীবল জীবিত থাকতেন, পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

খুক্‌খুক্ কাশির শব্দে চমকে পেছন ফিরে তাকালেন গৌর। দেখলেন, অন্ধকার ঘরের এক কোণে চুপটি করে বসে আছে বিকর্ণ। লোকটা কখন ঘরে এল, কখন বসলো, কিছুই টের পাননি। অবাক হলেন না গৌর। জনপদের গুপ্তচর-প্রধান বিকর্ণকে আজ থেকে চেনেন না উনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বিকর্ণ কি সত্যিই মানুষ, নাকি দেহহীন প্রেত?

'কী সংবাদ, বিকর্ণ?' — প্রশ্ন করলেন মহানাগরিক গৌর।

'প্রদীপগুলো কি জ্বালিয়ে দেবো?'— মিহি কণ্ঠে বলল বিকর্ণ।

'বাজে কথা রাখো। বলো, নতুন কী দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছো?'

‘সংবাদ নতুন কিছু নয়’— বলল বিকর্ণ, ‘গত ক’মাসে আরও কুড়িটি পরিবার শহরের উপকণ্ঠে এসে বাসা বেঁধেছে। এরাও সবাই অসু-উপাসক।’

‘হুঁ। যখন এ জনপদে আয়ের উৎস নিম্নমুখী, তখন প্রতিবছর এত নতুন লোক কেন এখানে এসে বাসা বাঁধছে।’

‘আজ্ঞে, আমি জানি না।’

‘জানো ঠিকই, মুখ ফুটে বলছো না। বলো, আর কী সংবাদ আছে।’

‘গতবছর পনেরোটি অসু-পরিবারের কন্যার সঙ্গে বাইরের ছেলের বিয়ে হয়েছে। এবছর সে সংখ্যাটা একশো চল্লিশ। এইসব ছেলেরা প্রত্যেকেই ঘরজামাই হয়ে এসেছে।’

‘হুঁ! দশ বছর আগে দুটি পরিবার দিয়ে শুরু হয়েছিল। আজ এই জনপদের অর্ধেক নাগরিকই অসু-উপাসক। আমার কি চিন্তিত হওয়া উচিত।’

‘অসুরদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নিশ্চিতভাবে অস্বাভাবিক। আর যে কোনো অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই চিন্তার বিষয়’ — বলল বিকর্ণ।

‘মহারাজ তা মনে করেন না’— বললেন গৌর, ‘তাঁর ধারণা, আমার নাকি সন্দেহবাতিক হয়েছে। শুনেছি উনি জনান্তিকে বলেছেন, ‘জম্বুদ্বীপের জনগণ জম্বুদ্বীপের যে কোনো প্রান্তে বসতি স্থাপনের জন্য স্বতন্ত্র। তাই শুধুমাত্র অসুবাদী হওয়ার কারণে এদের ওপর সন্দেহ করাটা অন্যায়। ওঁর বক্তব্য, দ্বারব্রহ্মার জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনপদের পক্ষে মঙ্গলকর। উত্তরাপথে যুদ্ধের কারণে সীমান্ত দপ্তরের করসংগ্রহ যখন নিম্নগামী, তখন নতুন জনগোষ্ঠীর আগমনে জনপদের রোজগার বাড়বে। তাই অসুবাদীদের আগমনকে আমার স্বাগত জানানো উচিত।’

মনটা আজ বড্ড খারাপ মহানাগরিক গৌরের। আজ ক’রাত ধরেই এক অদ্ভুত স্বপ্ন বারবার দেখছেন তিনি। দেখছেন, অন্ধকার এক ছায়া সমগ্র উত্তরাপথকে গ্রাস করে ব্রহ্মার দিকে এগিয়ে চলেছে শনৈঃ শনৈঃ। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সে ছায়ার পথরোধ করার। কিন্তু তাঁর হাত-পা কিছুই নড়ছে না। চিৎকার করার চেষ্টা করছেন, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। গৌরের আনমনা মনে অনেক চিন্তা ভেসে বেড়াচ্ছে আজ। নগরীর উদ্যানগুলির সৌন্দর্যের জন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধ ছিল দ্বারব্রহ্মা। আজ সেসব উদ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় না। সেগুলিকে জবরদখল করে তাতে বসতি করেছে অসুবাদীরা। উদ্যানের ভাস্কর্যগুলিকে ভুলুণ্ঠিত করেছে, বৃক্ষগুলির মূলোচ্ছেদ করেছে। নগরীর অসুর-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে নগররক্ষীরাও যেতে ভয় পায়। হত্যা ও লুঠতরাজ সেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ভারতের অধিকাংশ নগরীর মতোই দ্বারব্রহ্মার নারীরাও স্বাধীনচেতা, স্বনির্ভর। নারী-পুরুষ ভেদ নেই। কিন্তু আজকাল দ্বারব্রহ্মার মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শহরের নারী-বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অসুর-যুবকরা সেখানে দলবেঁধে ছাত্রীদের উত্যক্ত করত, সেখান থেকে প্রায়শই মেয়েদের অপহরণ করত। নারীহরণ ব্যাপারটা কী, সেটাই আগে বুঝতো না ব্রহ্মার নাগরিকরা। এখন দ্বারব্রহ্মার নারীহরণ এক সাধারণ ঘটনা। সবই অসুরদের প্রভাবে। তবু তাদের বিরুদ্ধে কিচ্ছুটি করা যাবে না, তাহলেই সমগ্র দ্বারব্রহ্মায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে। জম্বুদ্বীপের অন্য অধিবাসীদের মতো নয় এই অসুররা। কেমনধারা যেন এদের ব্যাপার-স্যাপার। এদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন। সব বিষয়েই এরা এদের উপাস্য অসুকে এনে ফেলে। আর প্রতিটি সুযোগেই মাতৃ-উপাসনার কুৎসিত নিন্দা করে। সেই নিন্দা প্রায়শই সক্রিয় বিরোধে রূপান্তরিত হয়। আর তাই নিয়ে ব্রহ্মাবাসীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি মারপিট শুরু হয়ে যায় রাস্তাঘাটে। এই চলছে নিত্যদিন। ব্রহ্মাবাসীরা অতিথিবৎসল, কিন্তু অতিথিসেবার নাম করে কতদিন আর তাদের ঠেকিয়ে রাখবো? একটা বড়সড় গোলমাল লাগতে চলেছে দ্বারব্রহ্মায়। আর যদি সেটা হয়, মহিষাসুর নিশ্চিত সেই ছুতোয় দ্বারব্রহ্মা আক্রমণ করবে। সেদিন কি মহারাজ অমিতবলের সামরিক সহায়তা সময়মতো এসে পৌঁছবে?

রুপোর থালার মতো ঝলমলে চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার ঝিলিমিলি আলো ঢেউ তুলেছে গঙ্গার বুকে। অনৈসর্গিক সেই সৌন্দর্য দেখে আজ মনটা কেন কু-ডাক ডেকে উঠল? অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন নিথর নিশ্চুপ মহানাগরিক গৌর। সঙ্গে বিকর্ণ।

ব্রহ্মার দক্ষিণভাগ জুড়ে সুবিশাল ঘন জঙ্গল। সেখানে মহীরুহ ও নদীনালার আঁকিবুকির ফাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য হোগলা কচুবন ও জলা, সাপখোপ কুমির ও বাঘের অখণ্ড রাজত্ব সেখানে। জম্বুদ্বীপের এই অঞ্চল সারা বিশ্বে যমের দক্ষিণদুয়ার নামে খ্যাত। নিঃশব্দ মৃত্যু এখানে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে সরল পথচারীর পদে পদে। এই অঞ্চলে যারা বাস করে, তাদের সাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না। দক্ষিণ ব্রহ্মার সেই অসমসাহসী বাসিন্দারাও কিন্তু এড়িয়ে যায় এই দ্বীপটাকে।

খাড়াই প্রাচীরের মতো পাড়। জোয়ারের সময়েও ভূপৃষ্ঠ এখানে জলতল থেকে প্রায় বিশ হাত উঁচুতে থাকে। মানুষজন আসে না এই দ্বীপে। যেসব মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তারাও কখনো রাত্রির আশ্রয়ের জন্য এখানে ডেরা বাঁধে না। লোকে বলে, অসংখ্য অতৃপ্ত বিদেহী আত্মার বাস এই দ্বীপে। অনেক ভয়াবহ আখ্যান জড়িয়ে আছে এখানকার জলজঙ্গলের সঙ্গে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তুঙ্গ স্রোত গঙ্গার একটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে অনতিদূরে। হাতে হাত ধরে বিশালাকায় জলধির রূপ ধারণ করে তারা ঝাঁপ দিয়েছে ব্রঙ্গাসাগরে। সাগর ও সাগরসমান নদীর দুই বিপরীতমুখী জলপ্রবাহের সংঘর্ষস্থলে রয়েছে দুর্ভাগা এই দ্বীপটি। মহার্ণবিক ঝঞ্ঝার প্রলয়ঙ্কর প্রবাহ প্রায়শই দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ে। এ দ্বীপে বাসা বাঁধা আত্মহত্যার সমতুল।

চিরকাল এ বন্ধ্যা দশা ছিল না এই দ্বীপের। প্রলয়ের পূর্বে ব্রঙ্গাসাগর অনেকটা দক্ষিণে ছিল। এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ছিল অনেকটাই ভিন্ন। সেসময় এই দ্বীপের আবহাওয়া ছিল মনোরম। সে যুগের অতি উন্নত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে দ্বীপের মধ্যভাগে। চার সহস্র বছর পূর্বের সেই প্রাসাদ, খিলান, দালান, ঘরবাড়ির ওপরে বট-অশ্বত্থের জঙ্গল গজিয়েছে। ধ্বংসাবশেষের সেই গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে রাস্তা চিনে প্রাণ নিয়ে বেরোনো প্রায় অসম্ভব। দ্বীপের আনাচে-কানাচে থিক্‌থিক্ করছে বিষধর সাপ, হিংস্র ব্যাঘ্র ও মহাকায় কুম্ভীরের যুথ। পথ চিনে ভুলভুলাইয়া থেকে বেরোতে পারলেও তাদের হাত থেকে নিস্তার নেই। যে গুটিকয় ব্রঙ্গাবাসী জানে এই গোলকধাঁধার পথ, তারাও আগ্রহবোধ করে না এখানে পা রাখতে। আজ একরকম বাধ্য হয়েই এখানে আসতে হয়েছে মায়াবলীকে। একটি প্রাসাদোপম নাটমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে উদ্বিগ্ন পদক্ষেপে পায়চারি করছিলেন তিনি। তাঁর সামনে ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপের ওপর উপবিষ্ট খর্বাকৃতি বলিষ্ঠদেহী এক যুবক। থুতনির নিচে চাপবাঁধা দাড়ি, চোখে ক্রূরতা ও শঠতার এক নৃশংস সংমিশ্রণ। মাথায় মহিষ-করোটি নির্মিত শিরস্ত্রাণ।

'মিত্র-বরুণ চিরকাল ব্রঙ্গাকে কোণঠাসা করেছে, বঞ্চিত করেছে' বলছিল যুবকটি, 'প্রাপ্য সম্মান পায়নি ব্রঙ্গাবাসীরা। আমরা অসুররা তার প্রতিবিধান করতে চাই। তাই...।'

যুবকটির কথাগুলো কানে ঢুকছিল না মায়াবলীর। 'কী যেন নাম তেমার?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'রক্তবীজ' বলল যুবক।

'রক্তবীজ? সে তো বহুকাল পূর্বে মারা গেছে। সূর্যমন্দির

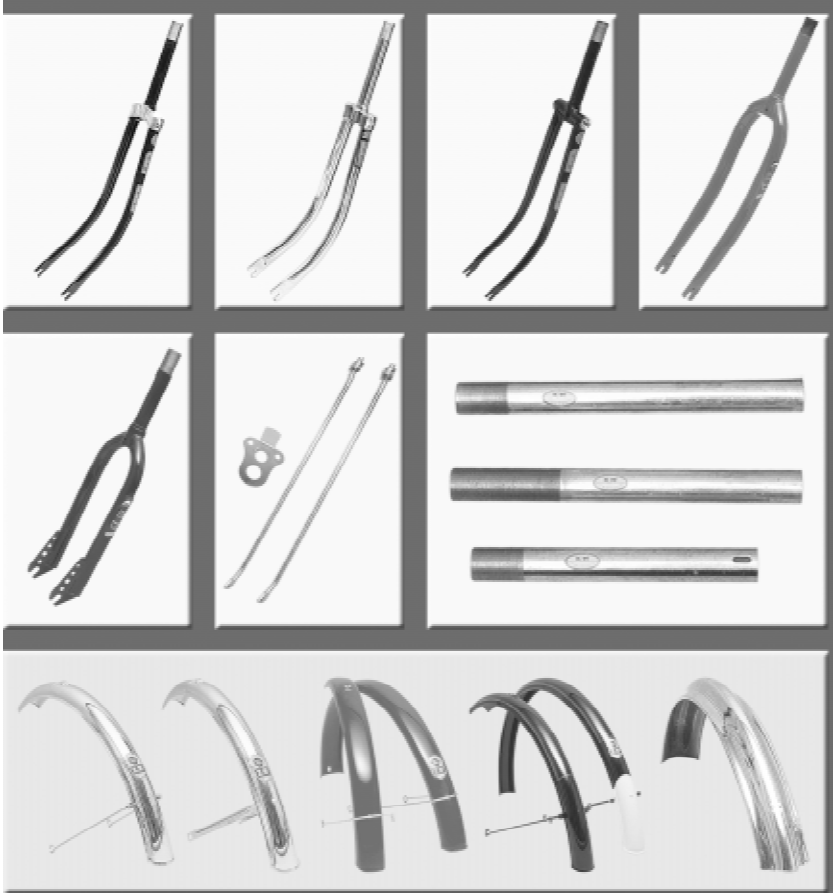

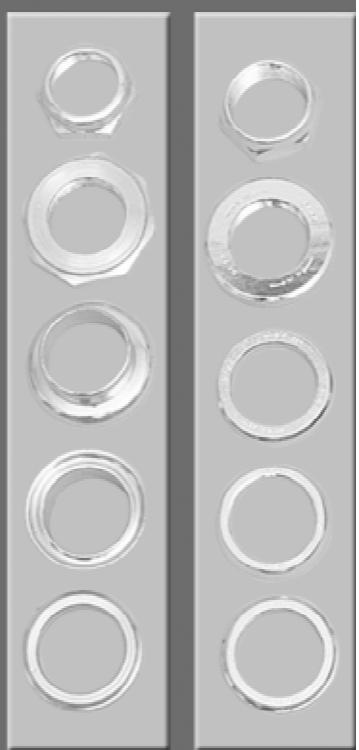

K.W
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

আক্রমণ করতে গিয়ে... সে তবে কে?'

'এক রক্তবীজ মরেছে, তার জায়গায় লক্ষ রক্তবীজ জন্মেছে'— যুবকের কণ্ঠে বেপরোয়া ঔদ্ধত্য।

'সে আবার কী করে হয়!'— যুবকের দাবি তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দিয়ে বললেন মায়াবলী, 'সে যাই হোক, তোমাদের প্রস্তাব কী, তা এখন পরিষ্কার করে বলো।'

'ব্রঙ্গার সিংহাসন আপনারই প্রাপ্য। আপনার পিতা মহীবল আপনাকেই সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। আপনার ভ্রাতা অমিতবল ছলনার দ্বারা আপনাকে বঞ্চিত করে সিংহাসনে চড়ে বসেছেন। আমরা অসুররা আপনার প্রাপ্য আপনাকে ফিরিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প।'

'তোমরা না আমার ভালো চাও, না ব্রঙ্গার ভালো চাও। তোমরা চাও শুধু অসুরদের ভালো। তোমাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তাই ওসব ধানাই-পানাই রাখো। তোমাদের এই সহায়তার কী মূল্য আমাকে দিতে হবে, সেটা বলো, তাহলেই চলবে।'

'আপনাকে একটা সামান্য কাজ করতে হবে আমাদের জন্য। আর তাতে আপনারই মঙ্গল। ব্রঙ্গাবাসীদের মধ্যে অসুধর্ম প্রচারে আমাদের সহায়তা করতে হবে।'

'সে আর এমন কী কথা! এই জম্বুদ্বীপে এত উপাসনা পদ্ধতি রয়েছে, আরেকটা নতুন উপাসনা পদ্ধতি থাকলে ক্ষতি কী? ঠিক আছে, আমি রাজি।' বললেন মায়াবলী।

'উত্তম', বলল রক্তবীজ, 'মহিষাসুর খুব খুশি হবেন। কে বলতে পারে, মহিষাসুর হয়তো আপনাকে বিবাহ করে ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী করতে পারেন।'

ভারত-সম্রাজ্ঞী! বুক দুরুদুরু করে উঠল মায়াবলীর। এও কী সম্ভব! এই বয়সে!

'আপনি যে আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে একমত, তার প্রমাণস্বরূপ একটি কাজ আপনাকে করতে হবে আজ।'— বলল রক্তবীজ।

'কী সেটা?'— প্রশ্ন মায়াবলীর। ক্ষণিক খুশির আড়ালে একটা সন্দেহ উঁকি দিল তাঁর মনে।

'আজ আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অসুধর্ম গ্রহণ করতে হবে। মাতৃপূজাকে পাপ বলে মানতে হবে। অসুই একমাত্র উপাস্য এবং মহিষাসুর তাঁর একমাত্র প্রতিনিধি, একথা মানতে হবে। সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, প্রাণ থাকতে এই সত্যপথ থেকে সরে যাবেন না।'

রক্তবীজের প্রস্তাবে বিচলিত বোধ করলেন মায়াবলী। অসুরদের সঙ্গে সন্ধি তো রাজনৈতিক ব্যাপার। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত উপাসনাপদ্ধতির কী সম্পর্ক? কিন্তু অসুরদের ব্যাপারগুলোই তো এরকম। এদের সবকিছুই মরণপণ। সব কিছুর সঙ্গেই এরা অসু-উপাসনাকে জড়িয়ে ফেলে। অসুরদের সহায়তা নেওয়ার এই মূল্য যে একদিন দিতে হবে, সেটা মায়াবলীর অনুমানের বাইরে ছিল না। এমনিতে মায়াবলী এমন কিছু ভক্ত নন শক্তিমাতার। ভক্তি ব্যাপারটাই কম তাঁর মধ্যে। কিন্তু একটা রাজনৈতিক সন্ধির দাম দিতে অনিচ্ছাতে ধর্মান্তরিত হতে হচ্ছে তাঁকে, একথা ভাবতেই বিবমিষার উদ্রেক হচ্ছে। তবে ভারত-সম্রাজ্ঞী সেটা হওয়ার জন্য তো সব কিছুই করা যায়, তাই না? কিন্তু এতকালের পরিচয় একদিনে মুছে ফেলা.... আর সেটা আজকেই? তাছাড়া... ব্রঙ্গাবাসীর বৈশিষ্ট্য তো তার মাতৃ-উপাসনায়। সেই বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলে নতুন এক উপাসনা পদ্ধতিকে মানতে হবে। শক্তিমাতা রুষ্ট হবেন না তাতে? কিন্তু কী করেছেন শক্তিমাতা আমার জন্য? আমার বিধিনির্দিষ্ট অধিকার খুইয়ে আজ আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শক্তিমাতা তো কই একটিবারও আমাকে সাহায্য করতে এলেন না? মিথ্যে, সব মিথ্যে। শক্তিমাতা মিথ্যে। কে বলতে পারে, হয়তো অসুরদের দাবিই সত্য। হয়তো অসুই একমাত্র উপাস্য। তাঁর উপাসনা করে যদি আমি ব্রঙ্গার সিংহাসন অধিকার করতে পারি, ভারত-সম্রাজ্ঞী হতে পারি, তবে তাই সই।

'এতেও আমি রাজি', — বললেন মায়াবলী, 'বলো, অসুধর্ম স্বীকার করতে হলে কী করতে হবে আমায়?'

'আরেকটি কথা', বলল রক্তবীজ, 'আপনার নামটি মাতৃ উপসনার পরম্পরায় দুষ্ট। নবধর্ম গ্রহণের অঙ্গ হিসাবে নতুন একটি নাম আপনাকে স্বীকার করতে হবে।'

'অসম্ভব!' চমকে উঠলেন মায়াবলী, 'যেই মুহূর্তে প্রজারা জানতে পারবে আমি নাম বদলেছি, তারা জেনে ফেলবে আমি মাতৃ-উপাসনা পরিত্যাগ করেছি। সেই ক্ষণেই তারা আমাকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'অবশ্যই। আমরা তা জানি। তাই আপনার নতুন পরিচয় এখন গোপনই থাকবে। আপনার ধর্মান্তরণের ঘটনাও গোপন রাখা হবে। যেদিন ব্রঙ্গার অধিকাংশ প্রজাকে অসুধর্মে ধর্মান্তরিত করা যাবে, সেদিনই আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করা হবে। আসুন, আর বিলম্ব করে লাভ নেই। এছাড়া তো আপনার আর কোনো উপায়ও নেই, তাই না?'

অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন মায়াবলী। আঁধার নামছে মানব বিবর্জিত দ্বীপে। পক্ষীকুলের হাহাকারে মথিত হচ্ছে সন্ধ্যার আকাশ-বাতাস। হে মা শক্তি! কী করব বলে দাও। একটা ইঙ্গিত দাও। শুধু একটা ইঙ্গিত।

না, তুমি নেই। তুমি মিথ্যে। সত্যি শুধু অসু। দ্বিধা-দ্বন্দের কোনো স্থান নেই আর। এটাই একমাত্র পথ।

সেই রাতে, রাতের আঁধারে, প্রলয়-পূর্ববর্তী ব্রহ্মার প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মাঝে অর্বাচীন ধর্মের যে আসুরিক উপাচার অনুষ্ঠিত হল, তার কথা বহির্বিশ্বের কেউ জানতে পারল না। কিন্তু জম্বুদ্বীপের ভবিষ্যতের ওপর তার প্রভাব পড়বে সুদুরপ্রসারী।

চরাচর জুড়ে এক অসীম শূন্যতার অনুভূতি ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে চরম শৈত্যের অনুভূতি। চির-তুষারের রাজত্ব এটা। দূরে ত্রিশূলাকৃতি বিশাল এক পর্বত আকাশকে আড়াল করে রেখেছে। দেখে মনে হয়, স্ফটিকের তৈরি পর্বত। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ। এবড়োখেবড়ো, পলকাটা পানপাত্রের মতো তার শরীর থেকে নরম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অনেক এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে সামনের উপত্যকায়। রাশি রাশি নরম বরফ পড়ে আছে তার উপর। সামনে কিছুটা দূরে একগাদা পাথর জড়ো করে স্তূপের মতো একটা আকৃতি বানিয়েছে কেউ। সেই স্তূপের কালচে পাথরে জায়গায় জায়গায় পড়েছে সাদা বরফের আস্তরণ। কালো পাথরে সাদা বরফ মিশে রং হয়েছে ধূসর। যেন ইস্পাতের স্তম্ভ, মহাপ্রস্থানের পথের শেষে যমের দক্ষিণদুয়ার। স্তূপের চূড়া থেকে দড়ি ঝুলছে, সে দড়ির অন্যপ্রান্ত বাঁধা পাহাড়ের প্রান্তে। একরাশ রঙিন পতাকা ঝুলছে সেই দড়ি থেকে। লাল, হলুদ, নীল, তুঁতে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। পতাকাগুলো ছটফট করছে সে বাতাসের তাড়নায়। নীল আকাশের বুকে সারিসারি শুধু কালো পাহাড়, সাদা পাহাড়। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তাদের শিখর, মন্দিরের চূড়ার মতো। যেন উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্রজোড়া অগুনতি আকাশছোঁয়া ঢেউ। ঠিক যে মুহূর্তে ঢেউগুলো সাগরে ডুব দিতে যাচ্ছিল, কোনো এক মহাজাগতিক জাদুকর মন্ত্রবলে তাদের থামিয়ে দিয়েছে। আকাশ ঝক্‌ঝকে নীল, তবু রাশি রাশি কুয়াশা পেঁজা তুলোর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। কুয়াশা নয়, মেঘ। শুধু চিরতুষারের রাজত্বই নয়, ওই মেঘের স্তরের নীচে রয়েছে চিরমেঘের এক রাজত্ব। সে রাজত্বের খবর বাইরের পৃথিবীর খুব কম মানুষই রাখে। মেঘের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেখানে। চির অন্ধকারের দেশে সেটাই একমাত্র আলো।

তুষারলোকে হঠাৎ উঠল ঝড়। মেঘের স্তর ভেদ করে দূর আকাশ থেকে কালান্তর যমের মতো নেমে এল গরুড়। একটা পাহাড়ের চূড়া বেছে নিয়ে বসলো তার ওপর। গরুড়ের পদদ্বয়ের অভিঘাতে একরাশ পাথর খসে পড়ল পর্বতগাত্র থেকে। 'যা' মহাপক্ষীর প্রশস্ত পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই পিঠে হাত বুলিয়ে বলল হরি, 'এখানে অনেক সাপখোপ পাবি। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর।'

'ক্যাঁয়াঁয়াঁয়া...' আওয়াজের সঙ্গে আবার আকাশে উড়ল গরুড়। দূর আকাশে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোমবস্ত্রে শরীর ভালোরকমভাবে আচ্ছাদিত করে তুষারাবৃত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল হরি।

গিরিবর্ত্ম বেয়ে কিছুদূর নীচে নামা, আবার কিছুদূর ওপরে ওঠা। দু-প্রহর সময় লাগল পাহাড়ের অন্যপারে পৌঁছতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। যেদিকে দুচোখ যায়, শ্বেতশুভ্র বন্ধুর পর্বতগাত্র জুড়ে রাশি রাশি ব্রহ্মকমল ফুটে আছে। পাহাড়ের সেই ঢাল গড়িয়ে নেমেছে লুকনো এক উপত্যকায়। সেখানে অনেক দূরে ধোঁয়াধোঁয়া অস্পষ্ট দেখা যায় ছোট্ট একটি গ্রাম। পবন-উপাসকদের গ্রাম এটি। গ্রামের এক প্রান্তে চিরহরিৎ বনাঞ্চল, অন্যপ্রান্তে বরফগলা নদী। তার ওপারে কী রয়েছে, দেখা যায় না। ওখান থেকে শুরু হয়েছে ঘন কুয়াশাঘেরা উপত্যকা।

পাকদণ্ডী বেয়ে প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত নামার পর চোখে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে প্রায় অদৃশ্য ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। দেওয়াল কাঠের, ছাদও কাঠের। কাছে গিয়ে দেখল হরি, দরজার ওপরে পদ্মফুল আঁকা। খুশি হয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে। কেউ নেই সেখানে। একটিমাত্র ঘর, বাহুল্যবিহীন অথচ পরিচ্ছন্ন। ঘরের এককোণে মাটিতে একটিমাত্র বিছানা, সাদা ধপধপে তার আবরণ। বিছানার মাথার দিকের দেওয়ালের এপান্ত থেকে ওপ্রান্ত জুড়ে বিরাট কাঠের তাক। তাতে অজস্র পুঁথিপত্র থরে থরে সাজানো। উল্টোদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে ভীষণাকৃতি নানান অস্ত্রশস্ত্র। তৃতীয় দেওয়ালটির গা ধরে রান্নার ব্যবস্থা। কাঠের পাত্রে আনাজপত্র কুটে রাখা আছে। কিন্তু তৈরি খাবার কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে। হতাশ হয়ে কুঁড়েঘরের বাইরে বেরিয়ে এল হরি। নামতে শুরু করল পাকদণ্ডী বেয়ে। আরও এক প্রহর পর সমতলে পৌঁছে দেখল, সেখান থেকে গ্রামটা স্পষ্ট দেখা যায়। উঁচু উঁচু কাঠের খাম্বা গ্রামের চারিদিকে, নানান রঙের পতাকা উড়ছে সেগুলো থেকে। থরে থরে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে রয়েছে গ্রামের সর্বত্র। তাদের মিষ্টি সুবাস ভাসছে বাতাসে। জায়গায় জায়গায় বেলনের আকৃতির অজস্র স্তম্ভ রয়েছে। ফাঁপা স্তম্ভ, গায়ে সারবন্দি মন্ত্র খোদাই করা। বায়ুর শক্তিতে নিরন্তর

ঘুরে চলেছে স্তম্ভগুলো। গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে কাঠের তৈরি বিচিত্রদর্শন এক মন্দির। গুনগুন নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। মন্দিরের ঠিক সামনে ঝুরঝুরো তুষারাবৃত ক্রীড়াঙ্গন।

ক্রীড়াঙ্গনের দুধারে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে শিক্ষার্থীরা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই বালক। বামদিকের বালকের হাতে অদ্ভুতদর্শন এক যুদ্ধাস্ত্র। দেখতে অনেকটা চাবুকের মতো, কিন্তু ইস্পাতের। অথবা এও বলা যায়, অস্ত্রটি বস্তুত তরবারি, যার ফলা নমনীয় ইস্পাতে তৈরি। দক্ষিণদিকের বালকটির হাতের অস্ত্রটিও নয়াভিরাম— সুদীর্ঘ মুষলের দুদিকে দুই ভীষণদর্শন পরশু। দুই প্রতিস্পর্ধীই বলিষ্ঠ, তেজস্বী। দুজনে একইসঙ্গে তাদের অস্ত্র আকাশের দিকে তুলে ধরল। দুই অস্ত্রের মিলিত ছায়া পড়ল মাটির ওপর, যেন কালসর্প ও ঈগল আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো ধরিত্রীবক্ষে। দুই প্রতিস্পর্ধীর মাঝে ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আখড়ার শিক্ষক। লোকটি হরির অতি-পরিচিত। চক্‌চকে মিশকালো গায়ের রং, দৃঢ় গড়ন, অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘদেহী। বয়স হরির মতোই হবে। লোকটির দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো হরি।

'কুরু।' সঙ্কেতজ্ঞাপক আহ্বানের সঙ্গে পিছনে সরে গেল দীর্ঘদেহী শিক্ষক। পরমুহূর্তেই রণহুঙ্কারের সঙ্গে বামদিকের প্রতিস্পর্ধী তড়িৎগতিতে আক্রমণ করল ডানদিকের প্রতিস্পর্ধীকে। তার হাতের শস্ত্র কুণ্ডলীমুক্ত সাপের ফণার মতো ধেয়ে গেল লক্ষ্যের দিকে। জবাবে প্রায় তিন হাত লাফ দিল পরশুধারী ছাত্রটি। ইস্পাতের ফলার চক্রাকার আক্রমণের অনেকটা ওপর দিয়ে ধেয়ে গেল প্রতিস্পর্ধীকে লক্ষ্য করে। পরশুর ফলায় সূর্যের আলো ঝলসে উঠল। আকাশ থেকে নেমে আসা বজ্রের মতো সে পরশু ভীমগতিতে আঘাত হানল বাম প্রতিস্পর্ধীর বক্ষ লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্যর্থ হল সে আক্রমণ। চোখের পলক ফেলার আগেই বাম প্রতিস্পর্ধী ভূমিসংলগ্ন সরীসৃপের মতো সর্পিলগতিতে বুকে হেঁটে সরে গেল অনেকটা দূরে। সেখান থেকে পরশুধারীর দিকে ছুঁড়ে দিল আরেকটি আক্রমণ। পরশুধারী আবার আকাশে দিল লাফ। এইভাবে চলল স্পর্ধা-প্রতিস্পর্ধার ঘাত-প্রতিঘাত, যেন সর্প ও ঈগলের মরণপণ যুদ্ধ। দুজনেই প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, অথচ কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না। যেন দুজনেই মন পড়ে ফেলতে পারছে, প্রতিটা আক্রমণ আগে থেকেই অনুমান করতে পারছে। আড়াল থেকে অসামান্য সে দ্বৈরথ উপভোগ করল হরি।

'স্তভ!' শিক্ষকের হুঙ্কারে লড়াই থামল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে অভিবাদন করে ফিরে গেল নিজ নিজ পংক্তিতে। অন্য দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী উঠে এল পংক্তি থেকে। নতুন আরেক প্রতিস্পর্ধা শুরু হল। দেখতে দেখতে সময়ের বোধ হারিয়ে ফেলেছিল হরি। এমন সময় গ্রামের মন্দির থেকে ভেসে এল শঙ্খধ্বনি। শারীরিক বর্গের সময় শেষ, এখন বৌদ্ধিক বর্গের সময়। প্রতিস্পর্ধা থামিয়ে সবাই মণ্ডলাকারে বসে পড়ল। আর তখনই দীর্ঘদেহী শিক্ষকের দৃষ্টি পড়ল হরির ওপর। দৌড়ে এল সে। চোখেমুখে ব্যাকুলতা, জড়িয়ে ধরল হরিকে।

'অনন্ত! কেমন আছো ভাই?' বলল হরি।

'তুমি! সত্যিই তুমি!' অনন্তনাগের গলায় অবিশ্বাস, 'কী করে এলে এখানে? সিন্ধু থেকে গঙ্গা, সর্বত্রই তো মহিষাসুরের সেনারা তাণ্ডব চালাচ্ছে। তবে কি তুমি ব্রহ্মা হয়ে এলে? এত তাড়াতাড়ি এলেই বা কী করে?'

'ওসব কথা ছাড়ো। এখন কিছু খেতে দিতে পারো? খিদেয় নাড়িভুড়ি হজম হওয়ার উপক্রম হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই। এ আবার একটা কথা হলো?' বলল অনন্তনাগ। 'উতঙ্ক', ছাত্রদের একজনকে ডেকে বলল সে, 'আজকের বৌদ্ধিক বর্গ তুমি নাও। মৎস্য অবতারের গল্পটি দিয়ে শুরু করতে পারো। আমার বন্ধু এসেছে, এদিক-ওদিক যেতে হতে পারে। ক'দিন হয়তো এ গ্রামে আসা হবে না। ভালো থেকো, পরে দেখা হবে।'

মল্লভূমি থেকে কিছুটা দূরে জরাজীর্ণ এক কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অনন্ত। 'বুড়িমা!' বলে ডাক দিল। সে ডাক শুনে লাঠিতে ভর করে ঠুক্‌ঠুক শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এল লোলচর্ম এক বৃদ্ধা। শনের দড়ির মতো চুল, বয়সের গাছপাথর নেই।

'কি রে অনন্ত?' খনখনে গলায় বলল বুড়ি, 'এসময়ে আখড়া ছেড়ে এলি? সঙ্গে এই ডাগরপানা ছেলেটি কে? আগে তো দেখিনি কখনো?'

'বুড়িমা', বলল অনন্ত, 'আমার এই বন্ধুটি অনেক দূর থেকে আসছে। খুবই ক্ষুধার্ত। ওদিকে আমার আবার আজ রান্নাবান্না কিছু করা হয়নি। কিছু কি আছে তোমার ভাণ্ডারে?'

'ওমা, সে আর থাকবে না? আয়, বোস। তবে যা দেবো, সব চেটেপুটে খেতে হবে কিন্তু। নাহলে এই লাঠি আমি আজ তোর আর তোর এই বন্ধুর পিঠে ভাঙ্গবো।'

উঠোনের পাশে রাখা পাত্র থেকে জল নিয়ে আচমন করে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করল দুজনে। বুড়িমা আসন পেতে ওদের বসিয়ে যত্ন করে খাওয়ালো। কন্দুকাকৃতি শুষ্ক রোটিকা, সূপ ও শুষ্ক মাংস। দক্ষিণের খাদ্যাভ্যাস থেকে অনেকটাই ভিন্ন। উপরন্তু হরি নিরামিষাশী। কিন্তু ক্ষুধার্ত মুখে সবই অমৃত বোধ হয়। তাছাড়া, বিষ্ণুপন্থার যাত্রীদের সবরকম খাদ্যেই অভ্যস্ত হতে হয়। প্রশিক্ষণের অঙ্গ সেটা। খাদ্য গ্রহণের সঙ্গেসঙ্গেই

দ্রুত দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়ে গেল, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে। ভোজন সমাধা হতে বুড়িমাকে প্রণাম করে ওরা বেরিয়ে এল বাইরে।

গ্রাম থেকে বেরোনোর সময় পথে পড়ল মল্লভূমি। হরি দেখল, সবাই সেখানে সাগ্রহে বসে গল্প শুনছে। উতঙ্কর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'আমরা সবাই মিলেই বিষ্ণু। আমাদের মতো অসংখ্য বিষ্ণু ছড়িয়ে আছে জম্বুদ্বীপের সর্বত্র। বিষ্ণুর সহস্রহস্ত, সহস্রপদ, সহস্রলোচন। যদি একটিও প্রাণী দিনশেষে অভুক্ত থাকে, বিষ্ণুর অগোচরে থাকে না তা। সেই অভুক্তর ক্ষুন্নিবৃত্তি করা প্রতিটি বিষ্ণুর দায়িত্ব।'

আখড়াটিকে পেছনে ফেলে শান্ত গ্রামটিকে পাশ কাটিয়ে কুয়াশাঘেরা উপত্যকার দিকে এগিয়ে চলল ওরা দুজন। ঢালু জমি গড়িয়ে নীচে নামার সঙ্গেই একরাশ কুয়াশা ধেয়ে এল। সঙ্গে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। গলা শুকিয়ে এল হরির। মনে হল, বুকের ওপর কেউ একটা ভারি পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে। শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র কাঁপিয়ে বান ডাকছে শৈত্যের। হাত-পা শরীর ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে হরি। অনন্তনাগ কিন্তু দিব্যি গুনগুন গান গাইতে গাইতে মন্দগতিতে হেঁটে চলেছে, যেন এই ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। আচমকা চোখধাঁধানো আলোয় ভাস্বর হয়ে গেল চরাচর। চোখ ঝলসে গেল হরির। পরমুহূর্তেই কানফাটানো আওয়াজে কেঁপে উঠল পৃথিবী। পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল হরি, খপ্ করে ওর হাত ধরে নিল অনন্তনাগ। একটু দাঁড়িয়ে একটা লণ্ঠন জ্বাললো ও। তারপর হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে আবার হাঁটা শুরু করল। লণ্ঠনের আলোতে পরস্পরকে দেখা গেলেও পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। একহাত দূরত্বে তো কিছুই দেখা যায় না। একটা জায়গায় এসে থামলো অনন্তনাগ। 'এই নাও, এটা চিবোও', বলে হরির হাতে কিছু একটা গুঁজে দিল। ভেজা ভেজা, শিকড়বাকড় জাতীয় কিছু। মুখে পুরে চিবোতে শুরু করল হরি। কয়েক মুহূর্ত পার হলো। হঠাৎ যেন আগুনের স্রোত বইতে লাগলো শরীর জুড়ে। মুহূর্তে শরীর প্রচণ্ড গরম হয়ে গেল। যাবতীয় লোমবস্ত্র খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল হরি, তবুও গরমের হাঁসফাঁস ভাব যায় না। দরদর করে ঘামতে লাগলো ওরা দুজনেই। লণ্ঠন নিভিয়ে মাটিতে নামিয়ে রেখে হরির বাঁ-হাতের কবজি শক্ত করে ধরল অনন্তনাগ। তারপর মারল এক প্রকাণ্ড লাফ। অন্ধকারে কোথায় লাফালো, কিছুই বুঝলো না হরি। খানিকক্ষণ হু-হু বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়াল ওরা। তারপরই ঝপাং করে একরাশ বরফ-ঠাণ্ডা জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল ডুব, ডুব, ডুব।

হরি দেখল, চারপাশে এক অদৃষ্টপূর্ব জগৎ। কোটি কোটি স্বপ্রভ বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে জলে। তাদের নীল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জলের জগৎ। অদ্ভুতদর্শন মাছের দল সাঁতরে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে দিয়ে। স্বচ্ছ তাদের দেহ, মেরুদণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ভৌতিক আলো। কী না তাদের রঙের বাহার। লাল, নীল, হলুদ, কমলা, বেগুনি। আরও অনেক রং, যাদের নাম জানা নেই। সেসব রংয়ের অস্তিত্বই নেই ওপরের পৃথিবীতে। জলতলের সেই অচিন্ত্যনীয় জগতের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলল হরি ও অনন্তনাগ। নদীগর্ভের স্রোত টেনে নিয়ে চলল ওদের, দূরে, অনেক দূরে। অনেকক্ষণ পরে ভুস করে জলের ওপরে ভেসে উঠল ওরা, বুক তখন প্রায় ফাটো-ফাটো। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে পাড়ে এসে উঠল। তখনই খেয়াল করল, অন্ধকারের লেশমাত্র নেই আশপাশে। ঠাণ্ডাও কেটে গেছে কোনো মন্ত্রবলে। আবহাওয়া বেশ আরামপ্রদ। দেখল, চোখের সামনে আশ্চর্য এক পৃথিবী। সেই পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে বিশাল এক সরোবর। রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটে রয়েছে সেই সরোবর জুড়ে। গুনগুন শব্দে ভ্রমরকুল উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের ওপর। তিরতির কাঁপছে জলতল। সরোবরকে ঘিরে রেখেছে নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া এক মায়াকানন। অজস্র ফুল ফুটে আছে সেখানে। তাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে হলুদ পাথরের তৈরি উঁচু মন্দিরের চূড়া। মায়াকাননের ওপারে রয়েছে বিশাল এক শহর। পাথরের তৈরি সারবন্দি বাড়ি, গায়ে তাদের মণিমানিক্যের কারুকার্য। সোনার জানালা, সোনার দরজা। লাল মাটির পথ চলে গেছে শহরের দৈর্ঘ্য থেকে প্রস্থে। ছোটো বড় নানান আকৃতির উদ্যান ও ঝরনা রয়েছে সে পথের বাঁকে বাঁকে। পাখিদের গানে আর প্রজাপতিদের রঙে মেতে আছে সারা শহর। এই মায়াজগৎকে ঘিরে রেখেছে আকাশছোঁয়া খাড়াই পাহাড়ের দেওয়াল, বাইরের নির্দয় প্রকৃতি থেকে আড়াল করে রেখেছে। কুলুকুলু শব্দে বহু নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে সেই পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, বন্ধুর উপলখচিত গাত্র বেয়ে নেমে আসছে উপত্যকায়, শতধারায় প্রবাহিত হয়ে মিশছে এসে সরোবরে। উপত্যকার আকাশ বারোমাস মেঘে ঢাকা। তবু উপত্যকা আলোয় ছলমল। হীরের দ্যুতি নিয়ে নানারঙের অজস্র স্বপ্রভ আঁকিবুকি নিরন্তর খেলে বেড়াচ্ছে আকাশজুড়ে। মাঝেমাঝে দু-একটুকরো মেঘ ধীরে ধীরে নেমে আসছে মাটিতে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামছে সে মেঘের নরম শরীর থেকে। রামধনুর আলোয় রাঙিয়ে উঠছে মেঘলা আকাশ। মুগ্ধ হয়ে গেল হরি।

কেউ বলে সম্ভলা। কেউ বলে জ্ঞানগঞ্জ। কেউ আবার বলে স্বর্গ। কে জানে, সত্যিই তোমার কী নাম। বহু সমৃদ্ধ ও

বৈভবশালী নগরী আমি দেখেছি এ জম্বুদ্বীপে। কিন্তু একটা কথা তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, তুমি অনন্য। তোমার মতো পূত পবিত্র অভিরাম আর কেউ নেই এ জগতে।

'আমায় ক্ষমা করবেন', বলল বজ্র, 'কিন্তু এ তো অসু-উপাসকদের সঙ্গে বরুণ-উপাসকদের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে কে জিতল, কে হারল তাতে আমাদের কী আসে যায়?'

'আসে যায়', বলল হরি, 'যুগ যুগ ধরে আপনারা— জম্বদ্বীপের বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি-ভিত্তিক উপজাতিরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছেন। কিন্তু কখনো এরকম হয়েছে কি, বরুণ-উপাসকরা বজ্র-উপাসকদের বরুণ-উপাসনা করতে বাধ্য করেছে? আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাধান্য সৃষ্টির চেষ্টা করে গেলেও কেউ কারোর বিশ্বাসে আঘাত করেননি। অসুরদের সঙ্গে সমস্যা এখানেই। যদি আজ মহিষাসুরকে রোধ করা না যায়, তবে আগামী যুগে অসু-উপাসনা ভিন্ন অন্য কোনো উপাসনাপদ্ধতির অস্তিত্ব থাকবে না। যাবতীয় ইতিহাস, পরম্পরা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মনুসন্তানেরা কিম্ভূত এক জীবে পর্যবসিত হবে।'

'আপনার কথা মানলাম। কিন্তু মিত্র ও বরুণ, এই দুই সম্প্রদায় বিগত সহস্রাধিক বর্ষ ধরে জম্বুদ্বীপ তথা সভ্য পৃথিবীর অধিকাংশভাগ শাসন করে এসেছে। তারা শক্তিশালী, আর্থিকভাবে সম্পন্ন। বিপরীতে আমরা, বজ্র ও পবন— প্রান্তিক জনজাতি বই আর কিছু তো নয়। হ্যাঁ, সম্ভলার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু এই স্বর্গ আমরা সৃষ্টি করিনি। আমরা এর রক্ষক মাত্র। সম্ভলার সম্পদে আমাদের কোনো অধিকার নেই। কীসের শক্তিতে আমরা মহাবলী মহিষাসুরের সঙ্গে সংঘর্ষে যাব?'

'বজ্রদেব, আপনি নিজের ও পবনের শক্তিকে খাটো করে দেখছেন। হিমালয়ের দুর্গম বন্ধুর ভূমিতে মহিষসেনা অচল। এখানে লড়াই হবে মানুষে মানুষে। সেক্ষেত্রে সুবিধা আপনাদেরই। মধ্য হিমালয়ের প্রতিটি পার্বত্য যোদ্ধা আপনাদের মানে। দুর্ধর্ষ সেই পার্বত্য যোদ্ধাদের সমতুল্য যোদ্ধা মহিষাসুরের সেনায় নেই। উপরন্তু মহিষাসুরের সেনা হিমালয়ের পথঘাট চেনে না, যেটা আপনারা চেনেন। মহিষসেনাকে একবার এই মধ্য হিমালয়ে টেনে আনতে পারলে তার প্রভূত শক্তিক্ষয় ঘটানো যাবে। তাছাড়া, শুনেছি এই সম্ভলায় বহু দিব্যাস্ত্র সঞ্চিত রয়েছে। প্রলয়-পূর্ববর্তী সভ্যতার প্রযুক্তিতে নির্মিত সেইসব দিব্যাস্ত্রের কোনো উত্তর মহিষাসুরের কাছে নেই।'

'অসম্ভব। সেইসব দিব্যাস্ত্র ব্যবহারের ওপর কঠিন নিষেধজ্ঞা রয়েছে। সে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। আমরা তা অমান্য করতে পারি না।'

'সে নিষেধ সাধারণ পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য। এটা অসাধারণ পরিস্থিতি। ধরুন, যদি অতর্কিত আক্রমণে মহিষাসুর স্বর্গ অধিকার করে, তখন সে যে এইসব দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ শুরু করবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে? সে প্রয়োগ করার আগেই আপনারা প্রয়োগ শুরু করবেন, এটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?'

'মহিষাসুরের পক্ষে সম্ভলার পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সে তো আপনি জানেন। তাই দিব্যাস্ত্রের নাগাল সে কোনোকালেই পাবে না।'

'এতটা নিশ্চিত হওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' বলল হরি, 'মহিষাসুরের চতুরতার কথা সর্বজনবিদিত। মহিষাসুর অমুকটা করতে পারবে না, মহিষাসুর তমুকটা করতে পারবে না— এরকম সব ভাবনা থেকেই অগ্নি, সূর্য ও বরুণদেবের পতন হয়েছে, সে তো আপনি জানেন। সে ভুল আশাকরি আপনারা করবেন না। বারবার আক্রমণের পদ্ধতির পরিবর্তন করে এসেছে সে ঐন্দ্রজালিক দানব। আর এভাবেই সে একের পর এক প্রবল শক্তিশালীদের হারিয়েছে।'

'যাই হোক,' বলল পবন, 'দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের সময় হয়ে এল। আপনারা খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিন। ইতিমধ্যে আমিও একবার বিষয়টি নিয়ে বজ্রের সঙ্গে আলোচনা করে নিই। আসুন, আমরা একপ্রহর পরে আবার মিলিত হই।'

সেই মুহূর্তেই সম্ভলার সীমানা থেকে দূরে তুষারনদীর জলে ভেসে আসছিল সাতটি গোলাকৃতি ডোঙানৌকা। মহিষের কালো চামড়ায় ঢাকা তাদের দেহ। পারিপার্শ্বিক থেকে, নদীর কালো জল থেকে তাদের পৃথক করে চেনা যায় না। ক্রমাগত আকাশজুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশ আলো হয়ে যাচ্ছে চোখধাঁধানো দিব্যালোকে। পরমুহূর্তেই ঝুপসি আঁধার নামছে। দুধারে খাড়াই পাড় কূপের দেয়ালের মতো আকাশ পর্যন্ত উঠেছে। ঝোড়ো বাতাস, উথালপাতাল নদী, আলো আঁধারের টানপোড়েন— কোনোকিছুই যাত্রীদের মনোবল টলাতে পারছে

না। কুয়াশার অন্ধকার ভেদ করে দিব্যি এগিয়ে চলেছে তারা, ছন্দোবদ্ধভাবে। নৌকা সাতটির মধ্যে একটির সওয়ার মহিষাসুর স্বয়ং। হাতে তার ভূর্যপত্র নির্মিত এক মানচিত্র। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে মানচিত্রের এক কোণায় ব্রহ্মার রুদ্রাক্ষমালার চিহ্ন অঙ্কিত। উল্কার আলোকে মহিষাসুর সেই মানচিত্রটিকে নিবিষ্টমনে অনুধাবন করে চলেছে। মিলিয়ে দেখছে আশপাশের ভূপ্রকৃতির সূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে। নদীর একটি বিশিষ্ট বাঁকে এসে দাঁড়বাহকদের ঈশারা করল মহিষাসুর, সাতটি নৌকাই থমকে দাঁড়াল।

'ঠিক এখানে পাথরের মধ্যে গর্ত করে বিস্ফোরক প্রয়োগ করো'— বলল মহিষাসুর।

মধ্যাহ্নভোজন ব্যাপারটা খুব সরল এই সম্ভলায়। গাছে গাছে ফলে আছে কত না সরস সুপক্ব ফল। পছন্দমতো পেড়ে নিয়ে সরোবরের ধরে বসে পড়ে সবাই। সেখানে লঘু আলাপচারিতার সঙ্গে সম্পন্ন হয মধ্যাহ্নভোজন। অন্য নাগরিকদের থেকে একটু দূরে সরোবর-সংলগ্ন একটি শিলাপট্টের ওপর বসে হরি ও অনন্তনাগ ভোজন সমাধা করছিল। হরি একটি বৃহৎ রক্তবর্ণ ফল সংগ্রহ করেছিল। অজানা সে ফল খেতে গিয়ে দেখা গেল, খোসা তার অতীব পুরু বহু কষ্টে সেই খোসা ছাড়িয়ে সবে ফলের রসাস্বাদন শুরু করেছে, এমন সময় মাটি কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প? হইচই পড়ে গেল নাগরিকদের মধ্যে। হরি ও অনন্তনাগ ভাবছিল কী করা যায় এই পরিস্থিতিতে। এমন সময় দেখা গেল, বজ্রদেব দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে।

'সর্বনাশ হয়েছে'— বলল বজ্র, 'মহিষাসুর আক্রমণ করেছে।'

'আক্রমণ! সেকি!' অবাক হরি, 'মহিষাসুর... এখানে?'

'আর এই ভূমিকম্প?' প্রশ্ন অনন্তনাগের।

'ভূমিকম্প নয়, আমাদের সরোবরের জল আসে তুষারনদী থেকে, সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। বিস্ফোরক প্রয়োগ করে মহিষাসুর সেই সুড়ঙ্গের জল বন্ধ করে দিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই সরোবর শুকিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, তুষারনদীর জল হিমশীতল হলেও সরোবরের জল ঈষদুষ্ণ। এর কারণ তুষারনদীর জল ভূগর্ভস্থ একটি লাভার স্তরকে ছুঁয়ে আসে। আর এই উষ্ণ জলের কারণেই সম্ভলার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। তুষারনদীর জল আসা বন্ধ হয়ে গেলে ওই লাভাস্তর থেকে লাভা প্রবাহ ধীরে ধীরে সরোবরের নীচের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সম্ভলা ডুবে যাবে লাভাপ্রবাহে।'

'হুঁ'— বলল হরি, 'এখন আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল এখানকার নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া।'

'সেটা সম্ভব। একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ রয়েছে, যার মাধ্যমে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সবাইকে উপত্যকার বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে। পার্বত্য গ্রামগুলিতে আশ্রয় পাবে নাগরিকরা। কিন্তু সম্ভলার কী হবে? প্রলয়-পূর্ববর্তী সভ্যতার সমস্ত জ্ঞানরাজি এখানে সঞ্চিত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে। এমন সমস্ত জ্ঞানের চর্চা হয় এখানে, যার বিষয়ে বাইরের পৃথিবীর কোনো ধারণাই নেই। এছাড়া দিব্যাস্ত্রের কথা তো জানেনই। সে সমস্তকিছু এক লহমায় শেষ হয়ে যাবে, লাভাপ্রবাহে ডুবে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ ধরেই কিছু একটা ভাবছিল অনন্তনাগ। এবার সে বলল, 'পুরাকালে হিমালয়ের স্থানে এক সাগর ছিল। তাই এদেশকে বলা হয় জম্বুদ্বীপ। কালেদিনে সেই সাগরের স্থলে হিমালয়ের উত্থান হল। সে সাগর কিন্তু আজও রয়েছে। সে সাগর ভূগর্ভস্থ, বাইরে থেকে তাকে দেখা যায় না।'

'সে সাগর এখনও রয়েছে?' বজ্রের কণ্ঠে অবিশ্বাস, 'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমি অনন্তনাগ। আমার নাগজাতির বাস হিমালয়ের গুহাকন্দরে। যার সুড়ঙ্গের জাল পাতাল পর্যন্ত গিয়েছে। পাতালসাগরের অস্তিত্ব তাই আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'মানলাম' বলল বজ্র, 'কিন্তু তাতে কী সুবিধা হবে?'

'যেভাবে বিস্ফোরক প্রয়োগ করে মহিষাসুর হিমনদীর পথ বন্ধ করে দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই বিস্ফোরক প্রয়োগ করে পাতাল-সাগরের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া যায়। জলে নিমজ্জিত করে দেওয়া যায় সম্ভলাকে।'

'কিন্তু তাতে কী লাভ...'— বলতে যাচ্ছিল হরি। তাকে থামিয়ে দিয়ে বজ্র বলল, 'স্বর্গের মহিমা তার গোপনীয়তায়। আজ যখন মহিষাসুর স্বর্গের রাস্তা জেনে ফেলেছে, তখন দলে দলে অসুরসেনা স্বর্গ অধিকার করতে আক্রমণ চালাবে। ক'জনকে আটকাবো আমরা? একমাত্র উপায় হল, স্বর্গ আর নেই, এমন একটা ধারণা তৈরি করা। উপরন্তু জলে নিমজ্জিত হলে লাভাপ্রবাহ শীতল ও প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে, অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আর তার থাকবে না। সম্ভলার বাড়িঘর সব পাথরের তৈরি, তাদের জানালা-দরজা ধাতুনির্মিত। কষে বন্ধ করে দিলে জল ঢুকবে না। তাই ক'বছরের জন্য সম্ভলা জলে

ডুবে থাকলে ক্ষতি নেই। অন্তত মহিষাসুরের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। মহিষাসুরের কিছু একটা ব্যবস্থা করার পর সম্ভলাকে আবার উদ্ধার করা যাবে। আমি সম্মত এই পরিকল্পনাতে। এখনই পবনকে দায়িত্ব দিচ্ছি, নাগরিকদের স্থানান্তরের ব্যবস্থা শুরু করতে। তার পাশাপাশি আমি আপনার সঙ্গে কাজ করব, পাতালসাগরের উৎসমুখ খুলতে।'

তিনদিন পরের কথা।

অসীম অধ্যবসায়ে পাহাড় ডিঙিয়ে অন্যপারে এসে পৌঁছেছে মহিষাসুর। সঙ্গে তার পঞ্চাশজন শ্রেষ্ঠ সেনানী। পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা যাচ্ছে, সম্ভলা ডুবে গেছে ঘন কুয়াশায়। খেচরকুল দলে দলে শহর ছেড়ে উড়ে পালাচ্ছে। স্বর্গের অধিকার আর মাত্র ক'হাত দূরে। আনন্দে আজ নিজেরই পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে মহিষাসুরের।

নাগরিকদের হারানো সহজ। এই পরিস্থিতিতে তারা নিশ্চয়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইতস্তত দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে তারা কী আর লড়বে? হিসেবমতো লাভা পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়তে আরও দিনসাতেক লাগবে। তার আগেই যাবতীয় দিব্যাস্ত্র লুঠ করে পালাবো। যখন সারা জম্বুদ্বীপে খবর ছড়িয়ে পড়বে যে, মহিষাসুর স্বর্গ অধিকার করে দিব্যাস্ত্র হস্তগত করেছে, তখন সবাই বিনাযুদ্ধে আমার সামনে আত্মসমর্পণ করবে। এমনকী বিষ্ণুও আমার বিরোধিতা করার সাহস পাবে না। আমার অধীনে একত্রিত হবে সারা জম্বুদ্বীপ। সবাই অসু-র সত্যতা স্বীকার করে নেবে। দনুমাতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে ত্রিলোকে।

'অ্যাই, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নাম তোরা', সৈন্যদের উদ্দেশে হুঙ্কুর দিল মহিষাসুর। খাড়াই পাহাড়। ওঠা যতটা কঠিন, নামাও ততটাই কঠিন। পদে পদে পা পিছলে পড়ে মরবার ভয়। রাশিরাশি গ্রন্থিযুক্ত দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহাড়ের মাথা থেকে পাদদেশ পর্যন্ত। তাদের অবলম্বনে সাধ্যমতো গতিবেগ বাড়ালো অসুরসৈনারা। তড়িঘড়ি নামতে লাগল পাহাড় বেয়ে।

মহিষাসুর রয়ে গেল পাহাড়ের চূড়ায়। দিব্যাস্ত্রের প্রতীক্ষায়।

এই তিনদিনে সম্ভলার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। সরোবর শুকিয়ে গেছে। তার তলদেশে গভীর এক ফাটল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে অগ্নিবর্ণ গলন্ত লাভা। নাগরিকরা চলে গেছে সম্ভলা ছেড়ে। পাখি ও প্রজাপতিরাও যেন চলে গেছে কোথায়। যাবতীয় ফুল শুকিয়ে গেছে। যে বৃক্ষরাজি তিনদিন আগেও সরস ফলের ভারে নত ছিল, আজ তারা শুষ্ক মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে প্রলয়ের প্রতীক্ষায়। ঘন কুয়াশায় ভরে গেছে সম্ভলা। সেই কুয়াশায় গন্ধকের কটু গন্ধ। তিনদিন আগের সেই সজীব প্রাণবন্ত নগরীর সঙ্গে এই তমসাচ্ছন্ন মৃত নগরীর কোনো মিলই নেই। পাহাড়ের পাদদেশে প্রশস্ত এক চাতালে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিল হরি। কিছুক্ষণ আগেই পবনের নেতৃত্বে সম্ভলার নিবাসীরা গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। সুড়ঙ্গের মুখ কষে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভলায় রয়ে গেছে শুধু ওরা তিনজন— হরি, বজ্র ও অনন্তনাগ। বজ্র ও অনন্তনাগ এখন ভূগর্ভস্থ এক গুহাকন্দরে বিস্ফোরক রোপণ করছে। সেই ভূগর্ভস্থ গুহার বাইরেই বসেছিল হরি। বিস্ফোরক ফাটলেই পাতাল-সমুদ্র থেকে জলরাশি এসে সম্ভলাকে ডুবিয়ে দেবে। তার ঠিক আগে ওরা তিনজন পাহাড়ের চূড়ায় নিরাপদ উচ্চতায় উঠে পড়বে। পরিকল্পনা ঠিকঠাক পথেই এগোচ্ছে।

সমাধিস্থ মন। নানান চিন্তা পেঁজা তুলোর মতো ভেসে আসছে সে মনের আকাশে। তাদের আসতে বাধা দিচ্ছে না হরি। কিন্তু তাদের ধরেও রাখছে না। তাই কিছুক্ষণ পরেই অনাহূত সেসব চিন্তা বুদবুদের মতো ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্তে। চিন্তার সৃষ্টি করব না, রক্ষা করব না, ধ্বংসও করব না। ত্রিগুণাতীত তুরীয়ানন্দ অবস্থায় হরির চেতনা শরীরের গণ্ডী ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে সম্ভলার প্রতিটি কণিকায় ছড়িয়ে পড়ল। লাভার বুদবুদ, বাতাসের শোঁ-শোঁ, পাহাড়ের গা থেকে নুড়িপাথর খসে পড়ার চড়বড় শব্দ— সবকিছু ও ওর শরীরের মধ্যেই অনুভব করতে লাগল। আর তখনই অনুভব করল হরি, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। ভিটে মাটির ওপর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের শব্দ, জমাটবাঁধা কিছু চলমান অন্ধকারের নিঃশব্দে হেঁটে চলা, অপরিচিতি কিছু কটু গন্ধ। সবাই সম্ভলা ছেড়ে চলে গেছে, তাই না? এরা তবে কারা, অশরীরী প্রেতের মতো কুয়াশাঘেরা ক্ষীণালোকে পরিত্যক্ত সম্ভলার আনাচে-কানাচে

ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ধীরে ধীরে চোখ মেলল হরি। পদ্মাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। পাশে রাখা গদা তুলে নিল হাতে। কয়েক মুহূর্ত পার হলো। হঠাৎ করেই সম্ভলার ছায়ান্ধকার পথেঘাটে এক অদ্ভুত ছায়াবাজির খেলা শুরু হল। খানিকক্ষণ পরপরই গদার সঙ্গে বাতাসের ঘর্ষণের অস্পষ্ট শব্দ, সঙ্গে অচেনা গলার বোবা আর্তনাদ। একে একে মহিষাসুরের সেনানীরা উধাও হতে লাগল ইহলোক থেকে।

অসুরসেনা সম্ভলায় পৌঁছেছে, সে প্রায় দুই প্রহর হতে চলল। এখনও তারা দিব্যাস্ত্রর সন্ধান নিয়ে ফিরে এল না। হলোটা কী? অপদার্থ সব, একটা কাজ সময়মতো ঠিক করে করতে পারে না। অধৈর্য হয়ে মহিষাসুর পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করল। ঠিক সেইসময় গুরুগুরু শব্দে কেঁপে উঠল হিমালয়। দেখতে দেখতে রাশি রাশি জল কোথা থেকে যেন এসে উপস্থিত হল। অনেকটা ওপরে ছিল বলে রক্ষা পেল মহিষাসুর, কিন্তু কী হচ্ছে তা বোঝার আগেই মহিষাসুরের চোখের সামনে কানফাটানো শব্দে সম্ভলা ডুবে গেল প্রলয়ঙ্করী জলপ্রবাহে। এক মুহূর্ত আগেও যেখানে ছিল কুয়াশাঘেরা এক নগরী, এখন তার জায়গায় রয়েছে সাগরপ্রমাণ এক জলধি। কী হলো? এত জল এল কোত্থেকে? তবে কি হিমনদীর পথ আরও বড় হয়ে ঘুলে গেল? হা অসু! সম্ভলার দিব্যাস্ত্র উদ্ধারের তো কোনো উপায়ই রইল না। কী হবে এখন? এত চেষ্টা সব বিফলে গেল? কিন্তু সে যাই হোক, দিব্যাস্ত্র না পাওয়া গেলেও স্বর্গবিজয় তো হল। সমতলে ফিরে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে। মহিষাসুর স্বর্গ জয় করেছেন।

উৎফুল্ল মনে পাহাড় ডিঙিয়ে উল্টোপথে ফিরে চলল মহিষাসুর। একা।

দিনরাতের প্রভেদ নেই এখানে তবু বোঝা যায়, সম্ভলা জলমগ্ন হওয়ার পর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। ক্রমাগত পথ চলছে হরি। বরফের ওপর দিয়ে, পৃথিবীর দুর্গমতম অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে। একাকী। অভুক্ত। ক্রমাগত রক্তক্ষরণে ক্লান্ত। কী হলো অনন্ত ও বজ্রর? বিস্ফোরণের আগে ঠিক সময়ে ওরা কি নিরাপদ উচ্চতায় উঠে পড়তে পেরেছিল? হে মহাশক্তি, ওরা যেন নিরাপদে থাকে।

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

জলোচ্ছ্বাস যে ওকে ঠিক কোথায় এনে ফেলেছিল, সেটা আজও বুঝতে পারেনি হরি। চিরকুয়াশার দেশে আকাশ দেখা যায় না। তারকামণ্ডল দেখে দিকনির্ণয়ের উপায় নেই। বজ্রপাতের আলোয় পথ আরও গুলিয়ে যায়। আজও কোনো বসতির দেখা মিলল না। আজও দেখা মিলল না মেঘাবৃত উপত্যকা থেকে বেরোনোর কোনো পথ। অন্ধকারে চোখ অন্ধ হওয়ার দশা হয়েছে। ক্রমাগত বজ্রপাতের শব্দে কান হতে বসেছে বধির। সম্ভলা প্লাবিত হওয়ার মুহূর্তে জলের ধাক্কায় পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে বাম পায়ে যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তা আজও সমান তাজা। শরীরে আজ আর কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই। যখন এই পা-দুটো আর চলবে না, তখন কী হবে? আজ ক'দিন ধরেই চোখে ভুল দেখছে হরি। ভুল শুনছে কানে। হঠাৎ পাহাড়ের আড়ালে দেখতে পাচ্ছে জটাজুটধারী দীর্ঘদেহী প্রেতকল্প এক ছায়ামূর্তিকে। পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সে। এই ক'দিনে বেশ ক'বার পেছন থেকে মানুষের গলার চাপা আর্তনাদ শুনেছে হরি। যেন কাউকে অতর্কিতে বধ করা হলো। ফিরে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পায়নি। বরফে পা অসাড়। রক্তল্পতা ও চরম শৈত্যের প্রভাবে মস্তিষ্কবিকার শুরু হলো। বরফের স্তূপের ওপরেই এলিয়ে পড়ল হরি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল সবকিছু। নাকে ভেসে এল মলয়াদ্রির উষ্ণ বাতাসের সুবাস। ঘুম পাচ্ছে। চিরঘুম এল কি? তা এলই বা। কী আসে যায় তাতে? আধো নিদ্রা আধো জাগরণের মধ্যে হরি দেখতে পেল, ওর থেকে খানিকটা দূরে বরফঢাকা এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে আছে বিশালাকায় এক যোদ্ধা। একটা চোখের ওপর তরবারির কোপের দাগ। মাথায় মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ। শুনতে পেল সেই যোদ্ধা বলছে—

'জানি, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো না। কিন্তু মৃত্যুবরণের আগে একটা ভালো কাজ করে যাব। তোমার শিরশ্ছেদ করব। তারপর যদি মরিও ক্ষতি নেই। অসু আমাকে অসীম ঐশ্বর্য ও দিব্যাঙ্গনা বারবণিতাদের দিয়ে পরকালে স্বাগত জানাবেন। ইহকালে কীই বা আর আছে, বলো? শুধুই কষ্ট। তার চেয়ে তোমাকে মেরে যত শীঘ্র সম্ভব পরলোকে চলে যাই। তারপর তো শুধুই অনন্ত সুখ।'

হরি দেখল, সুদীর্ঘ এক খড়্গ উদ্যত ওর মাথার ওপর। অবশ হাতটাকে তুলে প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করল, হাত নাড়তেও পারল না। মহাশক্তিকে স্মরণ করে মৃত্যুর জন্য তৈরি হলো হরি। কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। খড়্গ নেমে এল না। ঝাপসা চোখে অবাক হরি দেখল, অসুর-যোদ্ধা পড়ে আছে মাটিতে। তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে সুদীর্ঘ এক ত্রিশূল।

হরির চেতনা ফিরল সংকীর্ণ এক গুহার অভ্যন্তরে। সে গুহার কেন্দ্রে বড়সড় এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তার আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে গুহার অন্তর। গুহার ছাদ থেকে লম্বা বটের ঝুরির মতো স্ট্যাল্যাকটাইটের স্তর ঝুলছে। আগুনের আলো তাদের নিয়ে আলোছায়ার আঁকিবুকি কাটছে। গা-ছমছম দেওয়াল জুড়ে বিচিত্র সব নকশা আঁকা। হরি অনুভব করল, কেউ ওর মুখ চেপে ধরে ঠোঁটদুটো ফাঁক করার চেষ্টা করছে। দুর্বল শরীরে প্রতিরোধের চেষ্টা করল ও। কিন্তু লোকটার মহাবলী বাহুদ্বয় ওকে মাটিতে চেপে ধরে জোর করে কিছু একটা খাইয়ে দিল। থক্‌থকে তরলজাতীয় পদার্থ। প্রচণ্ড কটু স্বাদ। বীভৎস তার গন্ধ। নাড়িভুঁড়ি উল্টে এল হরির। থুথু করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল, লোকটা ওর নাকমুখ টিপে ধরে জোর করে গিলিয়ে দিল সবটুকু। আর তখনই লোকটার মুখ দেখতে পের হরি। মানুষ নয়, প্রেত। মাথাভর্তি জটাজুট, দড়িপাকানো শ্মশ্রুগুম্ফ। প্রেতসদৃশ ফ্যাকাশে গায়ের রং। ভস্মাচ্ছাদিত নগ্ন শরীর। কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্মের কৌপীন। কপাল জুড়ে রক্তবর্ণের আঁকিবুকি। গলা বাহুমূলে জড়ানো রুদ্রাক্ষমালা। হাতে নরকপাল নির্মিত পানপাত্র। ওই পানপত্র থেকেই যে এইমুহূর্তে ওকে ওষধি খাওয়ানো হয়েছে, সেই ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল হরির।

'তুমি বিষ্ণু', জলদগম্ভীর স্বরে বলল সেই প্রেত। শুনে ধীরে ধীরে উঠে বসল হরি।

'তুমি কে, সেটা আমি জানি', বলল হরি, 'সমাজবিরোধীদের নিয়ে দল পাকিয়েছ তুমি। বিষ্ণুর সংগঠনের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছ। তুমি ও ব্রহ্মা মিলেই তো মহিষাসুরকে এতটা বাড়িয়ে তুলেছ। তোমার কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা আমার নেই। কিন্তু আজ তুমি আমাকে অবাক করেছ। অসুরদের সমর্থকই যদি তুমি হবে, তবে তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে এলে কেন?'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে রইল রুদ্র। কোনো উত্তর দিল না।

'কী হল', বলল হরি, 'বলো, কী উদ্দেশ্য তোমার?'

'ভুল হয়েছিল যে অসুরদের বিরোধিতা করিনি', বলল রুদ্র, 'ভেবেছিলাম, অসুবাদীরা বজ্র, পবন, অগ্নি আদি দেবতাদের মতোই আরেকটি সম্প্রদায়। এই জম্বুদ্বীপে এত সম্প্রদায় ও এত উপাসনাপদ্ধতি রয়েছে, আরেকটি থাকলে ক্ষতি কী? কিন্তু আমি আমার এই অভিমত পরিবর্তন করেছি।

অসুবাদ আরেকটি উপাসনাপদ্ধতি নয়, অসুবাদের লক্ষ্য সব উপাসনাপদ্ধতিকে ধ্বংস করে, এদেশের যাবতীয় বৈচিত্র্যকে শেষ করে দিয়ে তার অপৌরুষেয় সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটানো। আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই বিষয়ে তোমরাই ঠিক ছিলে, আমরা ছিলাম ভুল। কিন্তু এই যে তুমি বললে আমরা সমাজবিরোধী, এটা ঠিক নয়। সত্যি কথাটা হলো, বিষ্ণুর সমাজবদ্ধতা, অনুশাসন, নিয়মানুবর্তিতা— এসব সবার জন্য নয়। অসীম প্রতিভাধর কিছু মানুষ তোমাদের নিয়মানুবর্তিতায় প্রত্যাহত ও হতাশ হয়ে সমাজবিরোধী হতে বসেছিল। আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি। সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করেছি তাদের। সেটা তো সমাজবিরোধিতা নয়।'

'ঠিক বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।'

বিষ্ণুপথের যাত্রী হওয়ার শর্তই হল, আপন ব্যক্তিত্বকে সংযত করে অন্যদের সঙ্গে মাননসই করে পথ চলা। কিন্তু সেইসব মানুষদের কী হবে, যাদের ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিকের তুলনায় এতই ভিন্ন যে তাকে খর্ব করে পারিপার্শ্বিকের সমান করার অর্থ দাঁড়ায় মানুষটার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ? দু'ধরনের মানুষ হয়, যাদের বিষ্ণুর নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা যায় না। এদের মধ্যে প্রথম হলো সৃজনশীলদের দল। তাদের নিয়েই ব্রহ্মার সংগঠন। দ্বিতীয় দলে আছে বিনাশকারীরা। এরা শুধু ধ্বংসই চায়। এরা ভয় পেতে চায়— কিন্তু জগতে এমন জিনিস দুর্লভ, যা এদের মনে ভয় জাগাতে পারে। প্রাণের মায়া নেই এদের, মরতে এরা রীতিমতো ভালবাসে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ভাবনাটাই এদের কাছে ঘৃণা-উদ্রেককারী। পরিমণ্ডলের সমর্থন নয়, তার বিরোধিতাই এদের শক্তির উৎস। বীভৎসতায় এদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে, ধ্বংস করেই এদের আনন্দ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এরা খারাপ মানুষ। এরা সমাজবিরোধী নয়, সমাজ পরিত্যক্ত। এরা স্বভাবত নিঃস্বার্থ। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে এরা প্রেতবিশেষ। এরাই আসে আমাদের কাছে। এদের আদিযোগী শঙ্করের পরম্পরায় প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত করে আমরা সমাজের শত্রুদের ধ্বংসে নিয়োজিত করি। তাই, আমরা সমাজবিরোধী নই, বিষ্ণুর শত্রু নই।'

খানিকক্ষণ ভাবল হরি। তারপর বলল, 'তোমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যের আপাত বিরোধ রয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য আদতে সমাজের মঙ্গল। তাহলে আমাদের মধ্যে এই মতান্তর কেন?'

'মতান্তর তো রয়েছে। কীভাবে সামলাবো সে মতান্তর?' বলল রুদ্র।

'বিষ্ণু হিসেবে আমার উপলব্ধি বলে, সংগঠনেই রয়েছে সব প্রশ্নের উত্তর।'

'আমি তো আগেই বলেছি, বিষ্ণু-সংগঠনের ও শিব-সংগঠনের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়কে নিয়ে এক সংগঠন গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।'

'আমি সেকথা বলিনি', বলল হরি, 'আমি বলছি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন সামাজিক সংগঠনের সমন্বয় নিয়ে কিছু কাজ করা দরকার। যাতে ভিন্ন সংগঠন হয়েও আমাদের উদ্দেশ্যে সামঞ্জস্য থাকে। তেমনিভাবেই, অগ্নি-বায়ু-বজ্র-বরুণ-সূর্য আদি সব প্রকৃতিপূজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয় প্রয়োজন। তা না হলে যা ঘটে চলেছে, সেটাই ভবিষতেও ঘটে চলবে। আমাদের বোঝাপড়ার অভাবের সুযোগ নিয়ে মহিষাসুর একের পর এক যুদ্ধ জিতে চলবে। শেষপর্যন্ত রক্ষা করার মতো কোনো সমাজ আর বাকি থাকবে না এই জম্বুদ্বীপে।'

'আমি একমত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি হলো, ব্রহ্মা বাদে বাকি উত্তরাপথ মহিষাসুরের অধীনে। দাক্ষিণাত্যও কতকাল তার শ্যেনদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে, তা বলা যায় না। অগ্নি, বরুণ, সূর্য পরাভূত। বজ্র ও পবন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মহিষাসুরকে পরাজিত করার মতো শক্তি কোথা থেকে সংগ্রহ হবে?'

'জানি না, কোথা থেকে। কিন্তু শক্তি তো সমাজেই লুকিয়ে রয়েছে। তাকে খুঁজতে হবে, জাগাতে হবে। জম্বুদ্বীপের পথে পথে ঘুরবো তার জন্য।'

'লোথাল থেকে গঙ্গানগর, কাশ্যপ-মীর থেকে কন্যাতীর্থ, সর্বত্রই অসুরদের গুপ্তচররা ছড়িয়ে আছে। তাদের চোখ এড়িয়ে কীভাবে সামরিক শক্তি সংগঠিত করব?'

'হুঁ। তুমি বললে— লোথাল থেকে গঙ্গানগর, কাশ্যপ-মীর থেকে কন্যাতীর্থ—। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো...' কী এক ভাবনায় ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গেল হরি।

'কী হল?' বলল রুদ্র।

উত্তর না দিয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে একখণ্ড অঙ্গার সংগ্রহ করে আনল হরি। তাই দিয়ে পাথরের মেঝের ওপর একটা ছবি আঁকল। উল্টোদিক থেকে রুদ্র দেখল, দুটি আগুনের শিখা— একই ভিত্তি থেকে উদ্গত হয়েছে।

'এটা কি, জানো?' বলল হরি।

'জানি, এ হল প্রাচীন জম্বুদ্বীপের পতাকা', বলল রুদ্র, 'একই ভূমি থেকে উদ্গত দুটি অগ্নিশিখা— সমুৎকর্ষ ও নিঃশ্রেয়স, উভয় জ্ঞানের সমন্বয়ের প্রতীক। ভা-রত অর্থাৎ জ্ঞানে নিরত এক ঐক্যবদ্ধ জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের পূর্বজরা, সেই কালাতীত কালে। অগ্নিশিখার রঙের ও আকৃতির

এই পতাকার তলায়ই তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সমগ্র দেশ। সে তো প্রলয়ের পূর্বের কথা।'

'সবই ঠিক বলেছে', বলল হরি, 'শুধু একটা কথা বাদ পড়ে গেছে। এই পতাকা শুধু আগুনের শিখা নয়, জম্বুদ্বীপের আকৃতিরও প্রতীক। আমার বামদিকের অংশটি দেখো। এটি হল দেশের পশ্চিম ভূভাগ, যাকে আজ আমরা জম্বুদ্বীপ বলে জানি। দেশের পূর্ব অংশটির কথা তো দেশবাসী ভুলেই গিয়েছে।'

'এটা কী বলছ। দেশের একটা অর্ধেক অংশ রয়েছে, যার কথা আমরা কেউ জানি না? যার কথা সবাই পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে গেছে? কেন হল এমনটা? কবে হলো?'

'ভালো করে দেখো, দুই অগ্নিশিখা যেখানে যুক্ত হয়েছে, সেখানেই রয়েছে ব্রহ্মা - ভারতের ভরকেন্দ্র, মা ভারতীর পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর যোগসূত্র। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মিলিত ধারায় বিধৌত সেই পূতভূমিতেই মানবমনের প্রথম অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ হয়েছিল। সেই অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ ছিল মাতৃ-উপাসনার মাধ্যমে, প্রকৃতি তথা মাতৃভূমিকে মাতৃজ্ঞানে ভালবাসা ও মহাশক্তিজ্ঞানে পূজার মাধ্যমে।'

'শুধু তাই নয়,' বলল রুদ্র, মাতৃভাবে ভাবিত হয়ে প্রতিটি জীবকে সন্তান মেনে জগতের কল্যাণের চেষ্টা, সেটাও মাতৃচেতনার অঙ্গ। মা হয়ে মায়ের পূজা। কিন্তু এসব তো বিলুপ্ত দর্শন। তুমি এসবের খবর রাখো? অবাক কাণ্ড!'

'অবাক হওয়ার তো কোনো কারণ দেখছি না,' বলল হরি, 'আমি এটাও জানি, ওই ব্রহ্মা থেকেই মাতৃমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র জম্বুদ্বীপে। কিন্তু কালান্তরে জম্বুদ্বীপের অধিকাংশ জনজাতিই সেকথা ভুলে গেল। সমগ্র সৃষ্টিকে মা বলে ভাবতে ভুলে গেল। প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড ভেবে তাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে সেইসব বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির আলাদা আলাদা উপাসনা শুরু হল। প্রকৃতির শক্তিকে নারীরূপে কল্পনার পরিবর্তে পুরুষরূপে কল্পনা করা শুরু হল। সে যুগে সেটাই ছিল প্রগতিশীলতা— যেমন এযুগে অসুবাদ। মাতৃ-উপাসনাকে কুসংস্কার ভেবে ব্রহ্মাবাসীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আখ্যা দিল লোকে। এর সঙ্গেই মিত্র-বরুণের যৌথ প্রতাপে সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সিন্ধু-সরস্বতীর খ্যাতিতে দেশবাসী ভুলে গেল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের কথা। ভারত-অন্বেষণের মূল পরিসর থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভিমানে ব্রহ্মা মুখ ফিরিয়ে নিল।'

'হ্যাঁ, আর ব্রহ্মাবাসীদের সেই অভিমানের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টায় আছে অসুররা, এ খবর আমি পেয়েছি,' বলল রুদ্র, 'কিন্তু এসব তো নিতান্তই প্রাচীন ইতিহাস, ব্রহ্মার কোনো গ্রামে বটবৃক্ষের পাদদেশে সায়ংকালীন অলস রোমন্থনে গ্রামের বৃদ্ধারা এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে, আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু এসব দিয়ে অসু সমস্যার সমাধান হবে কীভাবে?'

'সেকথাই বলছি, ধৈর্য ধরো। ভারতের কেন্দ্রভূমি ব্রহ্মা সুষুপ্তিতে নিমগ্ন হওয়ার সঙ্গেই দেশের পূর্ব বাহুটি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমরাও ভুলে গেলাম সেই বাহুটির কথা। ভুলে গেলাম, কী রয়েছে ব্রহ্মার ওপারে। এই দুর্ভাগ্য আজ এক সুযোগ এনে দিয়েছে। ভেবে দেখো, ভারতবর্ষের সেই বিস্মৃত অর্ধভাগের কথা কিন্তু মহিষাসুরেরও জানা নেই। ভারতের অংশ হওয়ার কারণে সেখানকার সামাজিক সংরচনা নিশ্চয়ই ভারতের পশ্চিমাংশেরই মতো। সেখানেও নিশ্চয়ই সামাজিক সংগঠন রয়েছে। সেখানে গিয়ে সেখানকার সামাজিক সংগঠনগুলির সহায়তায় মহিষাসুরের অজন্তেই আমরা এক সামরিক শক্তি সংগঠিত করতে পারি।'

নিষ্পলক চোখে রুদ্র কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সুদূর দক্ষিণ থেকে আগত শ্যামলা-রঙা মানুষটির দিকে। যে বিলুপ্ত জ্ঞানের উল্লেখমাত্র আজ আর কেউ করে না, তাকে পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন এই লোকটিও দেখে। এত জ্ঞান, এমন অদম্য দেশপ্রেম, এমন বিজিগীষা! বুক ভরা এত স্বপ্ন। মরতে মরতেও শয়নে জাগরণে শুধু সমাজের মুক্তির কামনা। কেন কে জানে, স্বল্প-পরিচিত এই মানুষটাকে আজ বড্ড আপন ঠেকছে।

'ব্রহ্মাবাসীদের সহায়তা প্রয়োজন তার জন্য,' হরি বলে চলে, 'শুধু মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই নয়, অসুবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক সংগ্রামেও তাদের সহায়তা প্রয়োজন। আর এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই খণ্ডিত ভারতবর্ষকে আবার অখণ্ডরূপ দেওয়া যাবে। কী হল, কী ভাবছ? কিছু বলছ না যে?'

আনমনা রুদ্র কোনো উত্তর দিল না। মুখ তুলে দেখল, গুহামুখের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে জেগেছে ছাই-ছাই আভা। ত্রিশূলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, হাত বাড়িয়ে দিল হরির দিকে।

'চলো বন্ধু। একটা দৃশ্য দেখাই।'

বন্ধু! সম্বোধনের আন্তরিকতায় অবাক হল হরি। হঠাৎ করেই আজ অনেকদিন পর ওর মুখে ক্ষীণ এক হাসির রেখা ফুটল। রুদ্রর হাত ধরে উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে দুর্বল পদক্ষেপে বাইরে এসে দাঁড়ালো। দেখল, কুয়াশার আবরণ অন্তর্হিত হয়েছে। আকাশ রাঙা করে সূর্য উদিত হচ্ছে— পূর্ব হিমালয়ের আড়াল থেকে, ব্রহ্মার দিক থেকে। সাদা বরফের ওপর গেরুয়া সূর্যের নরম আভা এসে পড়েছে। আকাশের ছায়া পড়েছে ভূলোকে। নিখুঁত সে ছায়া। কায়া আর ছায়ার আজ আর প্রভেদ নেই। দিগন্ত তাই মুখে গেছে। মনে হচ্ছে, ওপরে নীচে সর্বত্রই রয়েছে শুধু আকাশ। যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সমাহিত হয়েছে এক বিশাল কমলারঙা নরম স্ফটিকের গোলকে। অলৌকিক সেই গোলকের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে। প্রবল বাতাস

বইছে ঈশাণকোণ থেকে। রাশি রাশি কুয়াশার দল ফিরে যাচ্ছে পশ্চিমদিগন্তে। নবীন সূর্যের কিরণে প্রকৃতির ঘোর কাটছে। দূর আকাশ থেকে ভেসে এল ঝড়ের গর্জন। শব্দটা হরির অতি পরিচিত। ঝট্ ঝট্ ঝট্...— গরুড়ের ডানার গর্জন।

ঘন অন্ধকারের বুকে একবিন্দু সোনালি আলো সূর্যের দ্যুতি নিয়ে জ্বলে উঠল আকাশে। দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তার রক্তিম আভা। ধীরে ধীরে সেই স্বর্গীয় দ্যুতি গলন্ত সোনার মতো পাহাড়ের গা গড়িয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। সোনালি পাহাড়টার এবড়ো-খেবড়ো অবয়বে ভাস্বর হয়ে উঠল চিদাকাশের অন্ধ পটভূমি।

হিমালয়ের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ, পূর্বী পাহাড়ের উচ্চতম। এর মতো দুর্গম শৃঙ্গ হিমালয়ে আর দুটি নেই। গলন্ত সোনার স্রোত সেই শৃঙ্গ ছাড়িয়ে গোটা হিমালয়টাকে স্নান করিয়ে শেষমেষ পায়ের ঠিক সামনে এসে স্থির হল। অমানিশার নিদ্রা ভেঙে প্রকৃতি জেগে উঠল একরাশ পাখির কলকাকলিতে। পরিমণ্ডলের বিস্ময়কর সেই রূপান্তর একমনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন গুরুমশাই। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, সোনালি শৃঙ্গের বন্ধুর গাত্র জুড়ে অন্ধকার এক সঞ্চারমান বিন্দু ছটফট করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের খাঁজ থেকে খাঁজে। কী ওটা?

'অ্যাইইইইই!' জোরে হাক পাড়লেন গুরুমশাই।

সেই ডাক শুনে মুহূর্তের জন্য বিন্দুটির অনায়াস সঞ্চারণ থমকে গেল। তারপরেই যেমন করে আকাশের বুক থেকে উল্কা ঘসে পড়ে, তেমন করেই সেই বিন্দু খসে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে। ভীমগতিতে নেমে আসতে লাগল ভূমি অভিমুখে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তীব্র আতঙ্কে গুরুমশাই দেখলেন, আকাশ থেকে যে বিন্দুটি নেমে আসছে, সেটি বস্তুত একটি বালিকার অবয়ব। সে অবয়ব যখন মাটি থেকে প্রায় দশ মানুষ উঁচুতে, বালিকার দুই হাত থেকে ছিটকে বেরোলো রজ্জুসংলগ্ন দুটি খর্বাকৃতি ত্রিশূল। নিখুঁত লক্ষ্যে ত্রিশূলদুটি গেঁথে গেল পাহাড়ের খাঁজে। প্রবল ঝাঁকুনি লাগলো দড়িতে, মেয়েটির পতনের গতি রোধ করে স্থির হল সে দৃঢ় রজ্জু। পরমুহূর্তেই মেয়েটি আবার দিল লাফ। চোখের পলক ফেলার মধ্যে গুরুমশাই দেখলেন, অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, টানা টানা বিরাট চোখ, পরণে রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ। কোঁকড়া ঘন কালো একঢাল চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠ জুড়ে, গড়িয়ে নেমেছে কোমর পর্যন্ত। দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতদুটি অজানুলম্বিত। এই নিদারুণ শীতেও কপাল জুড়ে জমে আছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। পরিশ্রান্ত কপোলদুটি রক্তাভ হলেও ঠোঁটের কোণে লেগে আছে অনায়াস এক হাসির আভা। ক্লান্তির লেখমাত্র নেই সেখানে। দিব্যতেজে জ্বলজ্বল করছে সারা মুখমণ্ডল। পিঠে বাঁধা মেষশাবকটিকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল মেয়েটি।

'প্রণাম গুরুমশাই।'

'দুর্গা, তুই! কী করতে ঐ অতো উঁচুতে উঠেছিলি?'

কী করি গুরুমশাই! বাজপাখিটা আবার দুষ্টমি শুরু করেছে। ভেড়ার বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়েছিল। ওটাকে উদ্ধার করতেই তো গিয়েছিলাম...'।

অবাক গুরুমশাই আর একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন মেয়েটির দিকে। মাত্র বারো বছর বয়স, এরই মধ্যে যাবতীয় শাস্ত্র ও শস্ত্রর জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলেছে মেয়েটি। বিস্ময়কর ধীশক্তি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তির অধিকারিণী মেয়েটি। অধিকারিণী অবিশ্বাস্য শারীরিক সক্ষমতার। পূর্বী পাহাড়ের মেয়েরা সবাই অল্পবিস্তর ডানপিটে হয়। কিন্তু এই মেয়েটিকে যেন কোনো হিসেবের মধ্যেই আনা যায় না। প্রকৃতি যেন তাঁর সবটুকু উজাড় করে সৃষ্টি করেছেন এই বালিকাকে।

'পাঠশালার সময় হয়ে এল। যা, তৈরি হয়ে চণ্ডীমণ্ডপে চলে আয়। দেরি করিস না যেন।'

'দেরি হবে না গুরুমশাই', বলল মেয়েটি।

দড়িদড়া ত্রিশূল সব সংগ্রহ করে ভেড়ার বাচ্চাটিকে সঙ্গে করে গ্রামের পথে পা বাড়াল মেয়েটি। তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন অন্যমনস্ক গুরুমশাই।

মা। আমার মন বলছে, বিশাল কোনো দায়িত্ব প্রতীক্ষারত রয়েছে তোর জন্য। এই হিমালয়ের থেকেও বড় কোনো দায়িত্ব। নাহলে এ হতে পারে না। শক্তিমাতা কি আর শুধুশুধুই তোকে নিজের ছাঁচে গড়েছেন? শুধুশুধুই কি আর তোকে এত শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? অলৌকিক এই শক্তি, নিশ্চয়ই প্রতীক্ষারত রয়েছে অসামান্য কোনো কাজের— ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম— তুই তো জানিস মা, কত কষ্টে রয়েছে তোর সন্তানেরা। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা তাদের সইতে হয় প্রতিদিন। সর্বব্যাপী বিনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের জীবন, তাদের সম্মান, স্বাধীনতা, সভ্যতা। তুই কবে আসবি, সেই প্রতীক্ষাতেই তারা আজও আশায় বুক বেঁধে রয়েছে। সেই আশাতেই তারা বেঁচে আছে। আসবি না তুই মা? আসবি না? ■

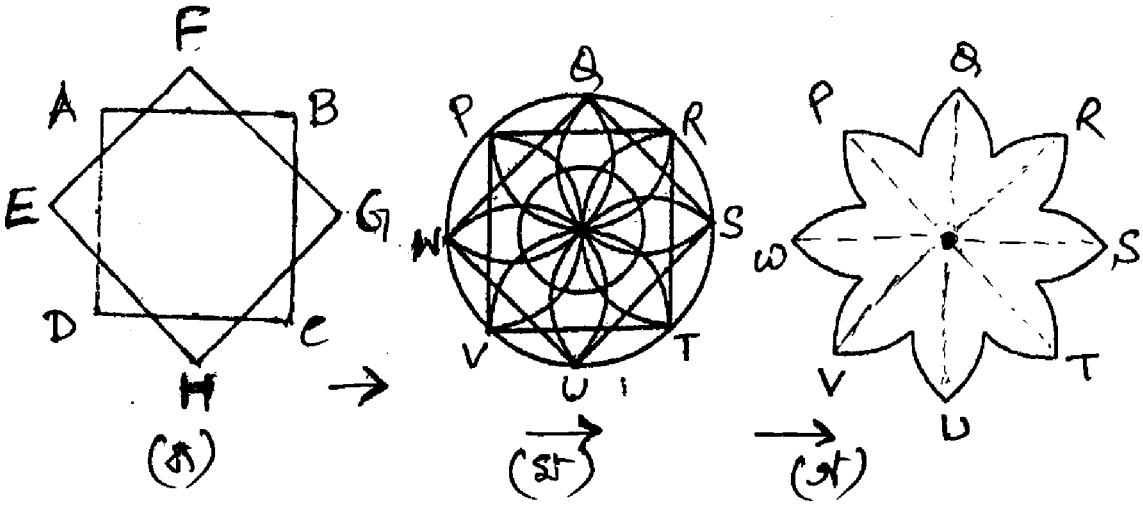

পদ্মপাপড়ি : জ্যামিতির সাহায্যে অঙ্কন

তন্ত্রে জ্যামিতি

সৌমেন নিয়োগী

হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক ও অত্যন্ত প্রচলিত এক উপাসনা পদ্ধতিই হল 'তন্ত্র', যার দ্বারা নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানকে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, যেখানে উপনীত হলে সাধক, উপাস্য ও সাধন পদ্ধতির কোনো পার্থক্য থাকে না, সেই চিদানন্দ অবস্থানে অগ্রসর, উপলব্ধি হওয়ার এক মাধ্যম বা প্রক্রিয়া। সংস্কৃত 'তন্' অর্থাৎ প্রসারণ, জ্ঞান আলোকের প্রসার— 'তন্য়তে বিস্তারয়তে জ্ঞানম্ অনেন্ ইতি তন্ত্রম্।' 'তন্ত্র' শব্দে সংস্কৃত 'তন্'এর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত 'ত্রা' 'তাত্রয়েৎ' অর্থ বাহক শব্দ রক্ষা করা বোঝায়, যার পূর্ণ অর্থ হলো জ্ঞান আলোকের প্রসারণ যা জীবাত্মাকে মায়ার বন্ধন থেকে রক্ষা করে। ফলত এর উদ্দেশ্য নতুনকে আবিষ্কার করা নয়। পরন্তু যা জ্ঞাত তাকে উপলব্ধি করা। তন্ত্র 'তত্ত্ব' ও মন্ত্রের এক বিপুল ভাণ্ডারের সংগ্রহ, যেখানে তত্ত্ব অর্থে মহাজাগতিক সত্যের বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ আর মন্ত্র হল অতিন্দ্রিয় শব্দ বিজ্ঞান সাধন, ফলেই এখানে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ আধ্যাত্মিক উচ্চতাতে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। জড় ও চৈতন্যের সুপ্ত ও প্রকাশের দ্বিবিধায় এই সৃষ্ট জগতে, কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে চৈতন্যশক্তির বিকাশ সর্ব উচ্চ পূর্ণতা লাভ করা হেতু সে আপনাকে জানার (Who am I?) উদ্দম্য ইচ্ছার ফলে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্র, দর্শন। যার থেকে গণিতশাস্ত্রও অভিন্ন নয় এবং পৃথিবীতে মনুষ্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে গণিতশাস্ত্র হয়ে উঠেছে তার সভ্যতার দর্পণ। তাই অরূপের রূপ সাধনে ব্রতী হয়ে জন্ম নিয়েছে সংখ্যা, দৃশ্য হয়েছে বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়ে ওঠা বিভিন্ন নক্শার। যথা— রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ ইত্যাদি। ফলত সৃষ্টি হয়েছে জ্যামিতি যা গণিতশাস্ত্রেরই এক বিশেষ শাখা। গণিতের এই শাখাকে প্রাচীন আর্যগণ চর্চা করেন ধর্মীয় ও বিভিন্ন যজ্ঞবেদী নির্মাণ কার্যে।

'তন্ত্র' সাধনার মূলে রয়েছে (ক) মন্ত্র ও (খ) যন্ত্র। 'মন্ত্র' শব্দের মধ্যে মানসিক কথাটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'ত্রা' প্রত্যয় যা কিনা কোনো যন্ত্র (instrument / tool) যুক্ত থাকা বোঝায়। ফলে এটি হল পণ্ডিত Heinrich Zimmer-এর ভাষায় "an instrument for evoking or producing something in our minds," specially "a holy formula or majic spell forevoking or bringing to mind the vision and inner presence of God"। অর্থাৎ যার দ্বারা মহাজাগতিক শক্তিকে একটি বিন্দুতে একত্রিত করা হয়। এক কথায় 'মন্ত্রশক্তি'। যন্ত্র হলো মন্ত্রেরই পরিপূরক, "The function of Yantra in the sphere of the visible is analogous to that of

mantra in the sphere of sound"। এমনটি ব্যক্ত করেছেন Philip Rawson তাঁর "The Art of Tantra" গ্রন্থে। যন্ত্র হলো এক প্রকার ইন্সট্রুমেন্ট যার দ্বারা 'ইম্' অর্থে, সংজিত, প্রশমিত, রাজত্ব, অধীন ইত্যাদি ক্রিয়াকে বোঝায়, যার সাহায্যে বস্তু বা জীবের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তিকে অধীনস্ত করা সম্ভব "a yantra is an instrument designed to curb the psychi forces by concentrating them on a pattern and in such a way that this pattern becomes by the worshiper's visualizing power. It is a machine to stimulate inner visulizations, meditations and experiences"--Heinrich Zimmer-এর প্রদত্ত যন্ত্রের সংখ্যা বিশেষ। কাজেই তন্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্র একটি বিশুদ্ধ জ্যামিতির বিন্যাস, যার মধ্যে নেই কোনো মূর্তিতত্ত্বের পরিচিতি। "Yantra is a pure giometric configuration without any iconographic representation"। যন্ত্র সাধারণভাবে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিষ্কাশনের এক প্রতিমূর্তি স্বরূপ। যার মৌলিক গঠনের উপাদানগুলি হলো বিন্দু, রেখা, ত্রিভুজ, বৃত্ত ও পদ্মের চিহ্ন। যেখানে এই আকৃতিগুলি পরস্পর পাশাপাশি স্থাপন, সংযুক্তিকরণ, ছেদ এবং বহুবার বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে উৎপন্ন করে সুনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলক্ষ্য। তন্ত্র মতে, স্পন্দনই হলো ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল উপাদান। যার থেকেই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন চলন ও আকার। যতই চলনের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ফলে ক্রমশ আকার ঘনীভূত হয়ে ওঠে গাণিতিক শূন্যের প্রতিমূর্তির আকৃতির ন্যায় সম্পূর্ণ 'বিন্দু'। চলন ধীরে ধীরে মন্থর হতে থাকলে গতি পায় স্রোতের এবং আকারের ঘটে ক্রমবিকাশ, বিন্দুর ঘটে মৌলিক জ্যামিতিক আকারে অভিব্যক্তি যতক্ষণ না বহুবিধ দেশ মিলেমিশে, সংযুক্ত হয়ে এক শক্তি উৎপন্নকারি সম্পূর্ণ আকার বিন্যাস করছে।

তন্ত্রের যন্ত্রের মূলে রয়েছে বিন্দু। "Every Yantra is structured around a central core, a central dot, whether depicted or not. A Yantra both unfolds from a focal point and returns to it"। কাজেই বিন্দুই হল সরল কল্পিত যন্ত্র। "The dot, the simplest conceivable Yantra, is also amazingly - the most concentrated, condensed of all. It is evergy all the more powerful as the dot, is small and compact"। বিন্দু অপরিমেয় কিন্তু সর্বদা বিদ্যমান সকল বস্তুর প্রাথমিক গঠনে, বিন্দুর মধ্যে শূন্য ও অসীম এই দুই মেরুরূপ আর এর মধ্যে যা কিছু সবই অন্তর্নিহিত ভাবে অবস্থান করছে। 'বিগ-ব্যাং', অধ্যাত্ম অভীধায় যা মহাপ্রলয় (বিস্ফোরণ?) ব্রহ্মাণ্ডের এই সূচনালগ্নই বিন্দু (.) রূপে নিমজ্জিত ছিল যা জ্যোতির্বিজ্ঞান ভাষ্যেও মেলে। কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যায় যাকে Wave ও Particle বলে সংযোজিত করা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে তা হল 'নাদ' ও 'বিন্দু'। 'তন্ত্রশাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম যখন পদার্থ সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মাণ্ড চেতনা-জ্ঞানে প্রথম শুরু এই বিন্দু দিয়েই। চেতনা ব্যতিরেকে পদার্থ আসলে অনেক অনেক বিন্দুর সমষ্টি বা অজস্র বিন্দু দিয়ে গঠিত। স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দের মতে, ''এরই ক্ষুদ্রতম প্রকাশের বৃহৎ রূপই আকাশ (space)।" শ্রেণী নিরবিচ্ছিন্ন বিন্দুর থেকে সৃষ্ট হয় রেখা, যা স্বাধীনভাবে চালিত হয়ে দৈর্ঘ্য প্রদান করে বৃদ্ধি ও বিকাশকে ব্যক্ত করে, যা ঠিক সময়ের ন্যায় অসংখ্য স্বতন্ত্র বিন্দুর দ্বারা গঠিত। তিনটি রেখার দ্বারা সর্বপ্রথম যে আবদ্ধকার দেশ বা আকৃতি সৃষ্টির সর্বপ্রথম লগ্নে চরম বিশৃঙ্খলা থেকে উৎপন্ন তা হলো ত্রিভুজ যা অত্যন্ত পবিত্র এক দেশকে মূল আদলরূপে চিহ্নিত করে। সুতরাং ত্রিভুজ সৃষ্টির সাংকেতিক অর্থই হল স্ফটিকের দানার মতো সৃষ্টির আদিরূপকে স্পন্দনের দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির অভিব্যক্তি হওয়া। তন্ত্র এই ত্রিভুজ যা তিনটি স্থানাঙ্ক যথা—

১) ক্রিয়ারূপ - আকৃতিরূপ - শক্তিরূপ।

২) স্বত্ত - রজঃ - তমঃ।

৩) ইচ্ছা - জ্ঞান - ক্রিয়া।

দ্বারা গঠিত আধ্যাত্মিক সাধকের অন্তরে প্রজ্বলিত এক অগ্নি শঙ্কু যা সর্বদা অসীমের সঙ্গে একত্রিকরণের জন্য সদা উন্মুখ তাকেই প্রকাশ করে যেখানে $\triangle$ পুরুষ ∇ প্রকৃতি।

"The two triamgles with their apex touching, opposite one another, represent the damaru, Shiva's as well as Dravadian's drum and symbolizes both the original vibration and the vibration which constantly ripples through matter, sustaining it, giving it being, They also refer to the begining of the manifestation as the two triangles, Shiva and Sahkti, meet"। অনুরূপভাবেই যখন ঊর্ধ্বমুখ ত্রিভুজ শীর্ষের দিকে অগ্রসর হতে থাকে দেশ ও সময় (Space & Time) ক্রমশ সংকোচিত হতে থাকে এবং সমস্ত সৃষ্টিই স্থিমিত হয়ে যায় পুনরায় সেই বিন্দুতে যা শিবের ডমরুর প্রলয়ের দিক নির্দেশ করে, সূচিত করে পরবর্তী সৃষ্টির। তাই সেই শিববিন্দুকেই মহর্ষি পাণিনি বলেছেন, সৃষ্টির উৎপত্তিস্থল। তন্ত্র তাই বিন্দুকে সমস্ত যন্ত্রের মূল বলে ধার্য করেছে, যা জ্যামিতির দিক থেকেও সম্পূর্ণ রূপে সত্য।

"The dimensionless point is the most elemental of geometrical forms. Without the point no circle can be drawn and no square constructed. The dot best represents the soul, the formless divine within us. Just as the existance of a circle presupposes the

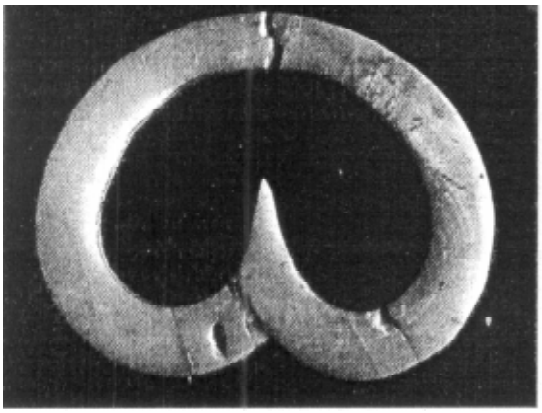

হরপ্পাযুগে হৃদপিণ্ড আকৃতির বস্তু, যা সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হতো।

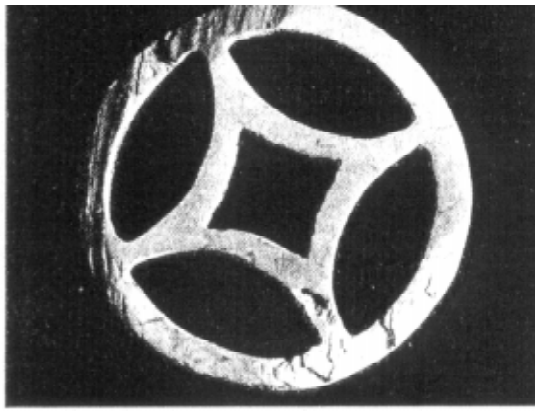

হরপ্পাযুগের বিভিন্ন টালির মধ্যে জেডযুক্ত বৃত্তের অঙ্কনের জন্য ব্যবহার করা হতো।

existence of the centre point. The existence of the world presupposees the existence of a witness to the world - the soul"।

যন্ত্রের বৃত্তের ব্যবহার প্রায়শ হয়ে থাকে, যা মূলত গ্রহের পরিবৃত্তাকার গতি থেকে গৃহীত এবং যা পূর্ণতাকেই প্রকাশ করে। "Perfect figure" যা জগতের সব রকমের সম্ভাবনাকেই বোঝায়। "The circle is the most spontaneous of natural shapes, taken by the horizon, by stars, planets and bubbles. It best represents the Hindu universe because Hindus see the world as being timeless, fetterless, boundless, cyclical and infinite. This universe is the medium through which the divine presents itself, hence for Hindus every element of this Universe can serve as a window to the divine"

Solid Geometry-র উপপাদ্য অনুসারে বৃত্তের পরিধি সহ কেন্দ্রবিন্দু আসলে একটি ত্রিভুজের বাহুকে অক্ষস্থ করে ঘূর্ণনের দ্বারা সৃষ্টির শঙ্কুর সমতলের উপর সৃষ্ট অভিক্ষেপন।

বর্গক্ষেত্র অপরিবর্তনশীল এক স্থিতি ভিত্তি প্রদান করা হেতু যন্ত্রের ৮টি মুখ দ্বারা বেষ্টিত চারমাত্রিক দেশ-সময় যা পৃথিবী তত্ত্ব, সকল প্রকার বলের পুঞ্জিকরণ এবং জগতের প্রকাশতলের পূর্ণতা প্রদানকারী এক সাংকেতিক চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত। বর্গক্ষেত্রের মধ্যে অঙ্কিত বৃত্ত সেই পূর্ণতাকেই প্রকাশ করে। "Squaring this tetrad give you sixteen, Tantra's sacred number" অর্থাৎ ১৬ কলা। "According to the science of Yantra, the square is a secred enclosure that opens on to the" outside "world through four T-shaped gares that are actually initiation threshoolds"। সকল প্রকার যন্ত্রে পদ্মপাপড়ি ব্যবহার করা হয়, যা প্রসারিত চৈতন্যকেই বোঝায়। *i.e. "Symbol of expanding conscicousness"*। প্রত্যেক যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বিন্দু, যার থেকেই সকল প্রকার জ্যামিতিক চিহ্নের বহিঃপ্রকাশ। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অনুসন্ধান করার এক সার্থক বস্তুই হলো যন্ত্র। যেখানে রয়েছে পদার্থ, সেখানে রয়েছে জ্যামিতি। 'Where these is matter, these is geometry -- Johannes Kepler"। যন্ত্রের ভূমিকাটি হচ্ছে অনেকটা আতস কাঁচের মতো। "Yantra, notably its central dot, is to the energy of the mind what a magnifying glass is to the sun's rays. The magnifying glass- an inert, passive instrument increases the power of the sun's rays without expending additional energy. Here lies one of Yantra's secrets this passive, geometrical drawing focuses, concentrates mental energy and reinforces the power of the mind. What are the limits of human mind thus focused, thus concentrated? Without the magnifying glass Yantra, the sun's rays would not be powerful enough to set fire to the piece of paper. Conversly, the magnifying glass would be powerless without the sun's rays"।

চার দ্বারযুক্ত বর্গক্ষেত্র বৃত্ত, পদ্ম, ত্রিভুজ ও কেন্দ্রস্থবিন্দু— এই মৌলিক জ্যামিতিক চিহ্ন যা পঞ্চতত্ত্ব ক্ষীতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের বোধক যন্ত্রের দ্বারা সহজেই ব্যক্ত হয়, এবং এঁকে দ্বিওত্রি মাত্রিক দৃষ্টিকোণে উপলব্ধি করাও সম্ভব। ভারতের মন্দিরগুলি একটি বৃহতকায় ত্রিমাত্রিক যন্ত্র। যেখানে মনের দ্বার উন্মোচিত হয়। মন — যন্ত্র— বৃহতমন্ত্র— মন্দির। 'তন্ত্ররাজ তন্ত্র' অনুসারে ৯৬০ প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার মধ্যে 'শ্রীযন্ত্র' বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও দার্শনিক দিক থেকে অনন্য। যদিও ঠিক কবে এই যন্ত্রের ধারণা ও গঠন উদ্ভব হয় সে ব্যাপারে সঠিক

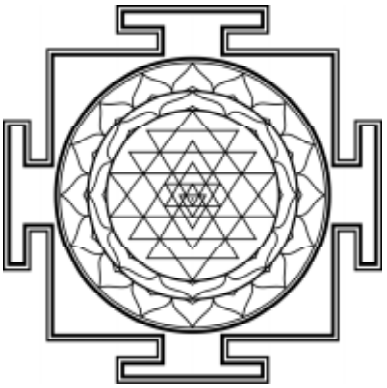

হরপ্পাযুগে জ্যামিতিক কোণ মাপার আদিমতম চাঁদা।

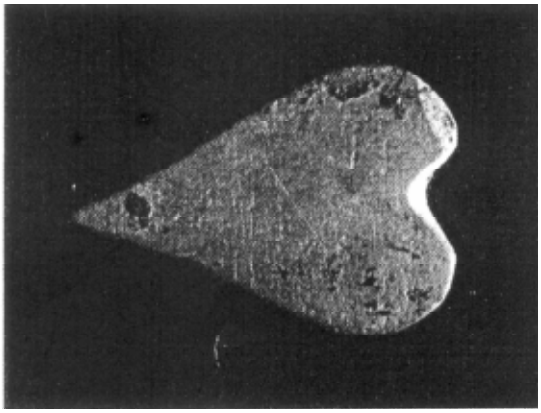

হরপ্পাযুগে অশ্বত্থপাতার মোটিফ (যোনীকুণ্ড)।

তথ্য পাওয়া যায়নি। তবুও কিছু তান্ত্রিক গ্রন্থ থেকে এঁর প্রকৃতি, গুরুত্ব, নির্মাণ প্রণালী ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে এর মৌলিক গঠনের কৃতিত্ব জগৎগুরু আদি শঙ্করাচার্যের উপর পরম্পরা অনুসারে বর্তায় বলে বহু পণ্ডিত মনে করেন। আধুনিক Cubism-এর ন্যায় হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক কলাও সৌন্দর্যজ্ঞাপন হেতু গণিতকেও দ্রবীভূত করছে। কাজেই এটা সংগত কারণেই বলা সম্ভব "The Yantra is exceptional synthesis of mathematics, meta physics and geometry. It shows the impression form of the supreme developing mathematically from a central point Bindu"।

শ্রীযন্ত্রের গণিত ব্যবহার অভূতপূর্ব যা Wagish Shulla-র মতে "The diagram consists of nine interwoven isosceles triangles. Four point upwords, they represent shiva, five point downwards they represent Shakti. Two irrational numbers of great significance pi and I + square root of five / 21 need to enter in it, just as they need to enter in the Great Pyramid. The second irrational number is the "Divine proportion 'also known as' goldenmean". But there are models of the Sri Yantra, which use spherical triangless and consequently the mathematics gets more complicated than it is in the case of plane triangles. Gerad Hues, a big name in computer science and at present, director of IPINRIA, France, has written a computer programme to construct the Sri Yantra, there is no recorded evidence that the kind of mathematical knowledge that is needed to construct the Sri-Yantra was available to professional mathematicians in India... Perhaps in India a unknown alternative to mathematical knowledge such as a 'higher developed tradition of special imagination existed"। এই বিষয়ে তিনি বর্তমানে উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজের গাণিতিক প্রতিভার উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, তাই এখানে সকল প্রকার চিন্তন, মনন, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে এটি নিত্য, কাজেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ফলত বৈজ্ঞানিক চিন্তনের মূলেও সেই ধর্মই অপ্রতিহত ভাবে পরিলক্ষিত এবং যার ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হেতু যজ্ঞবেদী নির্মাণের থেকেই এদেশে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল। তবে হরপ্পা যুগে তন্ত্রের জ্যামিতিক যন্ত্রের ব্যবহার ছিল কিনা এ ব্যাপারে সঠিকভাবে বলা অসম্ভব হলেও তথাপি খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন Art Effects থেকে বর্তমান তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবহৃত যন্ত্রের স্বরূপ অনেক সাদৃশ্যমূলক জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। Earnest Mackay লিখিত 'Early Indians Civilisation' গ্রন্থে ১৭ নং প্লেটে দেখা যায় একটি বৃত্তকে দুটি ব্যাসের সাহায্যে চারটি সমান অংশে ভাগ করা হয়েছে। ১৮ নং প্লেটে একটি বৃত্ত চারটি পাপড়ি আঁকা আছে। এটি করতে গেলে বৃত্তের পরিধিকে সমান ১২টি অংশে ভাগ করতে হবে। ওই একই প্লেটে বৃত্তের মধ্যে আটটি পাপড়ি আঁকা আছে। যা করতে গেলে বৃত্তের পরিধিকে সমান ২৪টি অংশে ভাগ করা দরকার। বৃত্ত আঁকতে ওরা একরকম যন্ত্র ব্যবহার করতেন।

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন শীলের motif-এর মধ্যে জ্যামিতির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়, যা বৈদিক গণিতে 'শুল্বসূত্র' নামে বিশেষভাবে পরিচিত এবং বিভিন্ন যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে শুল্বসূত্রের প্রয়োগ হয়েছিল। "Further move the letter of the Devnagari have been arranged

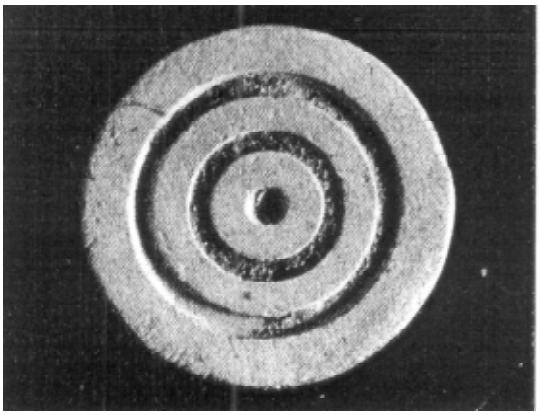

হরপ্পাযুগে নিখুতবৃত্ত— কেন্দ্রস্থ বিন্দুকে অঙ্কিত দুটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত।

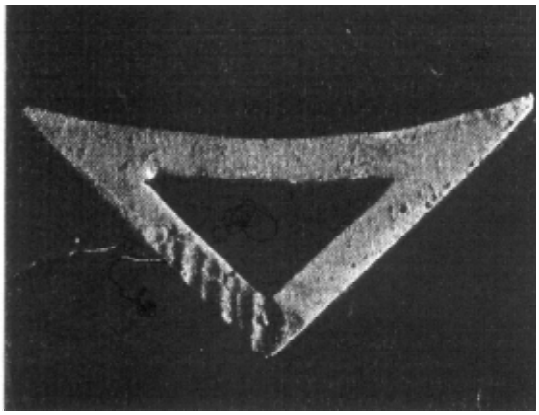

হরপ্পাযুগে প্রাচীন সেটস্কয়ার, যা সমকোণ, সমান্তরাল ও লম্বরেখা মাপার জন্য ব্যবহৃত হতো।

according to the cakras, the subtle centres of the body, in Tantric scriptures, and Tantra has its origin in the Indus Valley religion, as is evident from several tablets with sexual motifs"। ভারতীয় জ্যামিতিতে আকার ও চিত্র উদাহরণ স্বরূপ 'যোনীকুণ্ড' যা অশ্বত্থগাছের পাতার মতো দেখতে তন্ত্রে ব্যবহৃত যোনীকেই সাংকেতিক প্রতীক বলে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ফলে হরপ্পার শীলে বৃত্তস্থ অশ্বত্থ পাতার বিন্যাস কি আধুনিক তন্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রে আদি প্রতিকৃতি বলে মনে হওয়া খুব একটা অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। যদিও এর উপর আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

যেমন করে দুটি বর্গক্ষেত্র ABCD, EFGH এঁকে অপরকে ছেদ করে প্রতিস্থাপনের সঙ্গে প্রত্যেকের বাহু যথা AB, EF কে ব্যাস ধরে বৃত্ত অঙ্কন করলে P ও Q নামক পদ্মপাপড়ির জন্ম নেয় ঠিক সমস্ত বাহুগুলিকে অনুরূপভাবে অঙ্কন করলে ৮টি পদ্মপাপড়ি সৃষ্টি করা যায়। হরপ্পার শীল motif-এ ঠিক অনুরূপ প্রয়োগের আদি রূপরেখা লক্ষণীয়।

প্রকৃতির মধ্যে জ্যামিতিক চিহ্ন প্রথিত শুধু প্রয়োজন সেই চিহ্নগুলিকে সঠিক মাত্র ও তার দার্শনিক ও ধর্মীয় বিধি প্রয়োগ। তন্ত্রের যন্ত্রের আবির্ভাব ও প্রয়োগ সেই প্রকৃতিস্থ জ্যামিতিকে মানুষের হিতে ও আধ্যাত্মিক উন্মেষের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার এক সার্থক প্রচেষ্টা।

Referance :

1. Myths and Symbols Indian Art and Civilization, by Henrish Zimmor.
2. শূন্য = ওঁ A theory of Everything, অরবিন্দ প্রধান।
3. The Tantric way Art Science Ritual by Ajit Mukherjee, Madhu Khanna.
4. Tantra - The Cult of the Feminine by Andre Vau Lysebeth.
5. Sri Mook-ambika the Radiant Grace - Srikant.
6. The Art of Tantra - Philip Rauson.
7. Myth = Mithya A Hand book of Hindu Mythology - Dr. Dev Dutt Pattanaik.
8. Shiva Shakti - Mandira Ghosh.
9. The Indus Script and the Rg-Veda-Egbet - Richter Ushans.
10. প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত - নন্দলাল মাইতি।
11. মহর্ষি কপিল থেকে চন্দ্রশেখর - প্রশান্ত প্রামাণিক।
12. PDF Files-
    a) Tata Institute of Fundamental Science.
    b) Harappan Geometry - Chennai School of Mathematics.
    c) Mathematics of Sri Yantra.

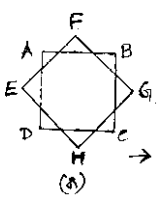

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

অ্যাকুয়ারিয়াম

সন্দীপ চক্রবর্তী

'আজকের আকাশটা দেখেছিস বুবুন! একদম ঝকঝক করছে। কে বলবে এটা শীতকাল। দেখে মনে হয় যেন শরৎকাল। ঠিক সেইরকম নীল। রোদ্দুরও তেমনি সোনালি। আমি বলছি, তুই মিলিয়ে নিস। তুইও খুব শীগগির ওই আকাশটার মতো ঝকঝকে হয়ে যাবি। কেউ বুঝতেই পারবে না তোর অসুখ করেছিল।'

আমার কথা শুনতে শুনতে বুবুন আকাশ দেখছিল। তার বিছানায় মিশে যাওয়া শরীরের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। শব্দটা আমার খুব প্রিয়। বুবুন যদি আকাশ দেখার জন্য ব্যালকনিতে যেতে পারত, কিংবা ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিত তাহলে আমি বোধহয় আনন্দে পাগল হয়ে যেতাম।

বুবুনের রুগ্ন আর ফ্যাকাশে চোখদুটো আমার দিকে ফিরল, 'আমি সত্যি সেরে যাব বাবাই?'

'যাবিই তো। ডাক্তারবাবু তো বলেছেন—'

সন্তানের সঙ্গে মিথ্যাচার করতে আগে অসুবিধে হতো। এখন আর হয় না। বুবুনের ক্যান্সার। ভারতবর্ষের পাঁচজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন, মেয়াদ বড়জোর এক বছর। তবুও আমি আর বরুণা পালা করে বুবুনকে স্বপ্ন দেখাই। নানা কথার ফাঁকে বলি, 'আর তো মোটে দু'মাস। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বুবুনের চোখে একটা সবুজ মাঠ ফুটে ওঠে। কখনও বা এক পশলা বৃষ্টি। মৃত্যু একদিন হঠাৎ আসুক। বুবুন যেন মৃত্যুকামনা না করে। বুবুন তা করেও না। হয় ছবি আঁকে নয় তো অ্যাকুয়ারিয়ামের গোল্ড ফিশের সঙ্গে খেলে। মৃত্যু অপেক্ষা করে কিন্তু জীবন ফুরোয় না।

বুবুনের আকাশ দেখা শেষ। বাইরের কোনো দৃশ্যে সে বেশিক্ষণ মনসংযোগ

করতে পারে না। কিন্তু এই দৃশ্যই যখন তার মনের গভীর ফুটে ওঠবে, সে তার মধ্যে বুঁদ হয়ে বসে থাকবে। তারপর একদিন পেন্সিলের আঁচড়ে ধরা পড়ে যাবে এই খুশির আকাশ। ছবি আঁকতে ভালোবাসে বুবুন। হাতে যদি সময় নিয়ে আসত তাহলে কোনো ড্রইংস্কুলে ভর্তি করে দিতাম।

ড্রইংবুকের পাতা উল্টে বুবুন বলল, 'আমার ছবি দেখবে না বাবাই?'

'তোর ছবি না দেখে আমি থাকতে পারি? কী এঁকেছিস দেখি—'

নদীর ছবি এঁকেছে বুবুন। নদীর ঘাট, গাছপালা, পাখ-পাখালি। বেশ প্রাণবন্ত ছবি। কে বলবে বুবুনের বয়স মোটে সাত বছর।

'খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু নদীতে একটাও নৌকো নেই কেন? গলুই দেওয়া একটা নৌকো থাকলে আরও ভালো হতো।'

'গলুই কী বাবাই?'

'ভুলে গেলি! সেই যে সেদিন আউট্রাম ঘাটে দেখালাম।'

'ও হ্যাঁ। গলুই। গলুইয়ের ওপর কাক।'

'এই তো তোর মনে আছে। আর একটা কথা, নদীর কোনো নাম দিসনি কেন?'

'নদীর নাম! কী নাম বাবাই?'

'মধুলেখা।'

'ধ্যাৎ! ও তো আমার নাম।'

'সেইজন্যই তো। মধুলেখার নদী মধুলেখা!'

অসুস্থ মেয়ের মনে বেঁচে থাকার ইচ্ছে চারিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার কোনো কাজ নেই। চাকরি একটা করি বটে, কিন্তু সেটা অনেকটা নিয়মরক্ষার মতো। অফিসে যতক্ষণ থাকি মন পড়ে থাকে বুবুনের কাছে। জানি, বরুণা আছে। কান্না গোপন করে মেয়ের জন্য সুখের উৎস খোঁজায় তার জুড়ি মেলা ভার। তবুও মনে হয়, একটাদিন বৃথাই নষ্ট হয়ে গেল।

অফিসে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। টেবিলে কয়েকটা জরুরি ফাইল। আজই ছাড়তে হবে। হাতমুখ ধুয়ে এসে কাজে মন দিই। সময় অলস বেড়ালের মতো এক-পা, দু-পা করে এগোয়। বারোটা নাগাদ বরুণার এস এম এস পেলাম। বুবুন ভালো আছে। গোল্ডিকে গান শোনাচ্ছে।

গোল্ডি মানে অ্যাকুয়ারিয়ামের গোল্ড ফিস। কিন্তু বুবুন কী গান গাইছে বরুণা লেখেনি। লিখলে পারত। লেখার থেকে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিলে সব থেকে ভালো হতো।

সরকারি অফিসে কাজ হয় দেরিতে। কিন্তু ছুটি হয় সময়মতো। কখনও কখনও সময়ের আগেই। আমার ছুটি ছ'টায়। রোজ সরকারকে পনেরো মিনিট গ্রেস দিই। আমার দেরি করে অফিসে আসার ক্ষতিপূরণ। কাউকে বঞ্চিত করতে চাই না।

কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে আমার ফ্ল্যাট। যাতায়াত মেট্রোয়। অফিসের দু-একজন সহকর্মীও কাছাকাছি থাকেন। তাঁরা মাঝেসাঝে অনুযোগ করেন, 'একদিন আমাদের সঙ্গে চলুন সুকুমারদা। দল বেঁধে বাড়ি ফেরার কী মজা টের পাবেন।' হেসে এড়িয়ে যাই। বন্ধুদের সঙ্গ আজকাল আর ভালো লাগে না। সবাই বড়ো সান্ত্বনা দেয়। নয়তো সাহস দেবার অছিলায় যুক্তিহীন প্রশংসা করে। আমার স্কুলের বন্ধু অনির্বাণ একদিন বলল, 'মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার মধ্যে একটা কাপুরুষতা আছে। তুই নিসনি সেটাই আসল।' আমি অবাক। মৃত্যু কারও মেনে নেওয়া না-নেওয়ার ওপর নির্ভর করে নাকি, না অপেক্ষা করে? মৃত্যুকে মানব না এতবড়ো শক্তিমান আমি নই। আমি শুধু চাই বুবুন যেন কোনো খেদ নিয়ে না যায়।

বাড়ি ফিরতেই বুবুন বলল, 'বাবাই, তুমি দশমিনিট লেট।'

অটোর লাইনটা আজ বেশ বড়ো ছিল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে চায়ের কাপ হাতে বুবুনের পাশে বসলাম।

'লেট করার জন্য তোমার পানিশমেন্ট হবে।'

'কী পানিশমেন্ট রে?'

'স্ট্যাচু।'

আমার নড়াচড়া করার অধিকার লুপ্ত। বরুণা চামচে করে চা খাইয়ে দিচ্ছে। বুবুন বলল, 'স্ট্যাচু আবার চা খায় নাকি? এ তো চিটিং।'

বরুণা বলল, 'খাইয়ে দিলে খায়।'

বুবুন হাসল। হাততালি দিয়ে বলল, 'ওকে। নরম্যাল।'

আমার এক হাতে চায়ের কাপ। অন্যহাতে বুবুনের ড্রইংবুক। জানতাম নদী আর নগ্ন থাকবে না। নৌকো ভাসবে। গলুই দেওয়া, মাঝির শক্ত হাতে করে রাখা নৌকো। আরও একটা ছবি এঁকেছে বুবুন। টালির চালের একটা বাড়ি। সামনে উঠোন। উঠোনে ফুলে ভরা একটা গাছ। তার নীচে ছোট্ট একটি মেয়ে। ফুল তুলছে।

'এই মেয়েটা কে রে বুবুন?'

বুবুন যেন হতাশ, 'তুমি না বাবাই একটা যাচ্ছেতাই।'

বরুণা হেসে বলল, 'এবার বল কার মাথায় বুদ্ধি বেশি। আমার না বাবাইয়ের?'

'তোমার।'

শেষমেশ রহস্যটা পরিষ্কার করল বরুণা, 'আসলে বুবুনকে চিনতে আমার মিনিট দশেক সময় লেগেছিল। তাতে মেয়ে বলল, বাবাই, দেখামাত্র চিনে ফেলবে। কারণ, বাবাইয়ের বুদ্ধি আমার থেকে বেশি।'

আমার বুদ্ধি কম তাই আনন্দ বেশি।

বুবুনের আঁকা ফুলের গন্ধে মন ভরে গেছে। চকোলেট কিনতে ছুটলাম। এমন একটা খুশির মুহূর্ত সেলিব্রেট করা দরকার।

দিন কাটে। গাছের পাতা ঝরার শব্দ শুনতে পাই। এক বছরের চারমাস কেটে গেছে। বাকি আট মাস। এর মধ্যে একদিন বুবুন চলে যাবে। কথাটা মনে পড়লে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। মানুষের এই সভ্যতাকে ফাঁকা বলে মনে হয়। আমার সাত বছরের মেয়ে অমরত্ব দাবি করেনি, আরও কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিল। এই সভ্যতা তাও দিতে পারল না।

কলকাতায় শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। রাতগুলো দীর্ঘ আর নিঃশব্দ। শুধু যখন বরুণা ডুকরে ওঠে, নৈঃশব্দ ভেঙে যায়। টের পাই বরুণা কাঁদছে। সারাদিন বরুণার সঙ্গে আমার একান্তে কোনো কথা হয় না। সবসময়েই আমরা বুবুনের কাছে। জীবনের ফুল ফোটাচ্ছি। মৃত্যুর আবর্জনা সাফ করছি। রাতে আমরা বস্তুজগতে ফিরি। বরুণা কাঁদে। আমি বলি, 'আঃ, বরুণা, কী করছ! বুবুন শুনতে পাবে।' বরুণা কান্না গিলে ফেলে বলে, 'না, না। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি দেখে আসছি।'

বরুণাকে দোষ দিই না। বুবুনকে নিয়ে কত স্বপ্নই না সে দেখেছে। আমরা দুজনেই মেয়ে চেয়েছিলাম। তাই বুবুনের জন্মের পর আমাদের সুখের অন্ত ছিল না। আমাদের একটু বেশি বয়েসের বিয়ে। আমি আটত্রিশ আর বরুণা পঁয়ত্রিশ। উচ্ছ্বাসের বয়েস সেটা ছিল না। কিন্তু বুবুন যত বড়ো হয়েছে আমাদের উচ্ছ্বাস তত বেড়েছে। যেন বুবুন আমাদের সন্তান নয়, ভালোবাসার প্রতিমা। বরুণা বলত, 'বুবুনকে আমি গান শেখাব। এখনই গান শুনে যেভাবে তালে তালে দোলে তাতে গান ওর হবেই।' আমার পছন্দ নাচ। ভরতনাট্যম। বুবুনের নাচ দেখে অডিটোরিয়াম হাঁ হয়ে যাবে। এই নিয়ে তর্ক, ঠাট্টা। বুবুনের হাততালি। আশ্চর্য সুন্দর সব দিন।

তারপর একদিন বরুণা বলল, 'মেয়ের লেখাপড়াও হবে বলে মনে হচ্ছে। একটা কাঠের ঘোড়া আর পেন দিয়ে বললাম, ধর তো দেখি। ওমা, মেয়ে অমনি পেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বরুণা একটা কাগজ এগিয়ে দিল। তাতে কয়েকটা এলোমেলো আঁচড়। সেই কাগজ এখনও আমার কাছে আছে। সাদা পাতার শূন্যতার সঙ্গে বুবুনের ঠাট্টা করার প্রথম স্মৃতি। নষ্ট করিনি। কোনোদিন করব না।

আমাদের রাস্তাটা ছিল আগাগোড়া মসৃণ। মনে মনে বলতাম, কোথাও পৌঁছাতে পারি বা না-পারি, এ রাস্তা যেন কখনও শেষ না হয়। অথচ রাস্তাটা

একটা খাদের কাছে এসে হারিয়ে গেল। একদিন হঠাৎ হাউজিংয়ের মাঠে খেলতে খেলতে বুবুন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তারপর একদিন রক্তবমি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা গেল ক্যান্সার। অ্যাডভান্সড স্টেজ। মেয়াদ বড়জোর এক বছর।

আজ সকালে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। পৃথিবীতে যেটুকু উষ্ণতা অবশিষ্ট ছিল তাও শুষে নিল মেঘ।

কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি বুবুন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময় শুয়ে থাকে। গোল্ডির সঙ্গে খেলে না। ছবি আঁকে বটে, কিন্তু বড় দায়সারা ভাবে।

বরুণা বলল, 'একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাও না। আমার খুব ভয় করছে।'

আমি জানি, কোনো লাভ নেই। প্রদীপ নেভানোর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা পিছনে ফেলে শিখা এবার নিভে যাবে। কিন্তু আমাদের হতাশ হলে চলবে না। বরুণাকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। আমাকেও থাকতে হবে।

প্রলয় তালুকদার কলকাতার নামকরা ক্যান্সার সার্জন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য আট মাস অপেক্ষা করতে হয়। বুবুনের বেলায় অবশ্য অন্য নিয়ম। বুবুনকে তিনি নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করেন। অনেকবার নিজে ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন। জীবনে তিনি বহু পেশেন্টের মৃত্যু দেখেছেন। কিন্তু বুবুনের মৃত্যু দেখতে চাননি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। সব কথা খুলে বললাম। বুবুনের অন্যমনস্কতা। মাঝেমাঝে জ্বর। ক্লান্তি। মন দিয়ে শুনলেন। কিছু বললেন না। পেপারওয়েট নিয়ে খেলছেন। আঙুলের ইশারায় পেপারওয়েট ঘুরছে। আবার উল্টো ইশারায় থেমে যাচ্ছে। একসময় খেলা ভাঙল। প্রলয় তালুকদার বললেন, 'আপনি ঈশ্বর মানেন সুকুমারবাবু? আমি মানি। মোটামুটি সব ডাক্তারই মানেন। মেডিকেল সায়েন্স যতই ডেভেলপ করুক, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পাল্টে দেবার ক্ষমতা তার কোনোদিনই হবে না। বুবুন ইজ সিলেকটেড ফর বিগার মিশন। তাই তাকে তিনি নিয়ে নেবেন। শুধু একটা অনুরোধ, দেখবেন বুবুন যেন মৃত্যুবোধে না আক্রান্ত হয়। আমি দেখেছি, সেন্স অব ডেথ অলওয়েজ ডেভেলপস দি উইল অব ডাইং।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঠেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে কলকাতা শহর।

আমার কোনোদিকে খেয়াল নেই। মাথার ভেতর ছুঁচ ফোটাচ্ছে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো। ওভাবে কখনও যে ভাবার চেষ্টা করিনি তা নয়। কিন্তু মন থেকে সাড়া পাইনি। নিজে করছি ভাবলে যে জোর পাই। ঈশ্বর করাচ্ছেন ভাবলে সেই জোর পাই না। অথচ আমার একরত্তি মেয়েটাকে ঈশ্বর আরও বড়ো কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন শুনলে কেমন যেন গর্ব হয়। চোখে জলও আসে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠায় হুঁশ ফিরল। বরুণার ফোন। ডাক্তারবাবু কী বললেন জানতে চাইল। বললাম। বরুণা কান্না চেপে বলল, 'এই কথা বললেন! কোনো ওষুধ দিলেন না?'

'ওষুধ নেই বরুণা। থাকলে তো বুবুন ভালো হয়ে যেত।'

টেলিফোনে অপার নৈঃশব্দ্য। কিছুক্ষণ পর বরুণা বলল, 'একটা প্রবলেম হয়েছে। অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছটা বোধহয় মরে গেছে। মরার মতো ভাসছে। কাঁচে টোকা দিলেও নড়াচড়া করছে না।'

'সে কী! বুবুন জানে?'

'জানে। আমি অবশ্য বলেছি, শরীর খারাপ হয়েছে। বাবাই এসে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবে।'

মনে হলো আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। বুবুনের চারপাশে তৈরি করা বৃত্ত কি মৃত্যু ছোট করতে শুরু করল? সঙ্কেত পাঠাল, 'আমি এসে গেছি। আজ তোমার গোল্ডিকে নিলাম। কাল তোমাকে নেব। তৈরি থেকো।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়ি ফিলাম।

বুবুন নিষ্পলক চোখে গোল্ডিকে দেখছিল। আমায় দেখে বলল, 'গোল্ডি খেলছে না কেন বাবাই?'

আমার হাত কাঁপছে। বরুণার চোখে উদ্বেগ। অ্যাকুয়ারিয়াম থেকে মরা মাছ বের করে বললাম, 'তোর গোল্ডির তো জ্বর হয়েছে বুবুন। খেলবে কী করে!'

বুবুন বলল, 'মাছের আবার জ্বর হয় নাকি!'

'বারে! সারাদিন জলে থাকলে হবে না?'

পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। আমি জলস্থল এক করে ফেললাম। যেখান থাকি তার কাছাকাছি অনেকগুলো অ্যাকুয়ারিয়াম ফিশের দোকান। কিন্তু যে কোনো গোল্ড ফিশে আমার চলবে না। যে মারা গেছে ঠিক তার মতো একটা চাই। ওই সাইজ, ওই রঙ এবং ওই স্বভাব। তবে না বুবুনের গোল্ডি জ্বর সারিয়ে ঘরে ফিরবে। আমার হাতে মৃত মাছের নমুনা। দোকানদার নমুনা দেখে ঘাড় নাড়ে। হুবহু ওই সাইজের মাছ একটাও নেই। গড়িয়ায় খোঁজা শেষ করে গোলপার্ক। সেখান থেকে গড়িয়াহাট হয়ে লেক মার্কেট।

অবশেষে পাওয়া গেল। এক সোনালি যুবরাজ বুবুনের দোসর হতে রাজি হলো।

বুবুন খুব খুশি। গোল্ড ফিশ অ্যাকুয়ারিয়ামে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুবুন কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখছে। মাঝেমাঝে টোকা দিচ্ছে কাঁচে। আজ কতদিন পর সে বিছানা থেকে উঠল। হঠাৎ বুবুন বেশ অস্থির হয়ে বলল, 'গোল্ডি আমাকে চিনতে পারছে না কেন বাবাই? এত করে ডাকছি সাড়াই দিচ্ছে না।'

'ডাক্তারবাবু খুব কড়া ওষুধ দিয়েছেন তো, তাই ওর ঘুম পাচ্ছে। দু-দিন যেতে দে, সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে।'

ধীরে ধীরে গোল্ডির সঙ্গে বুবুনের ভাব হয়ে গেল। জলের মাছ ডাঙার ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু বুবুন এখন আর গোল্ডির সঙ্গে খেলে না। শুধু অ্যাকুয়ারিয়ামের কাঁচে হাত বুলোয়। সঙ্কেত বুঝে গোল্ডি এগিয়ে আসে কাঁচের কাছে। বুবুনের আঙুলের সঙ্গে তার কথা হয়।

রাতে বরুণা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদে। আমি উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। আমাদের সব কথা পাশের ঘরে শুয়ে আছে। রাতের শব্দ হয়। রাত ভোর হলে পাখিরা ডাকে। জানালার শার্সিতে আলো এসে পড়লে বুঝতে পারি, সকাল হলো। বরুণা উঠে পড়ে। স্পষ্ট শুনতে পাই তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। আমি বলি, 'মেয়ের অকল্যাণ হবে বরুণা। দীর্ঘশ্বাস ফেলো না।' বরুণা চমকে ওঠে। বুকের রক্তপাত আঁচলে ঢেকে বলে, 'ভুল হয়ে গেছে গো! আর কখনো হবে না।'

আজকাল বুবুন হাঁটাচলা তো দূর, মাথা তুলে বসতে পর্যন্ত পারে না। অজ্ঞান হয়ে যায়। অ্যাকুয়ারিয়ামটা তাই বিছানার পাশে এনে রেখেছি। যাতে সে দেখতে পারে। ইচ্ছে হলে ছুঁতে পারে। ছবি তো আঁকে না। আঁকবেও না বোধহয়। জীবন বলতে এখন শুধু ওই অ্যাকুয়ারিয়াম। বাঁধন বলতে গোল্ডি।

একটু আগে সকাল হয়েছে। অ্যাকুয়ারিয়ামের কাঁচে আঙুল বুলিয়ে বুবুন কীসের যেন সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। মহানন্দে খেলছে গোল্ডি। হঠাৎ বুবুন বলল, 'গোল্ডিরা কোথা থেকে আসে তুমি জানো বাবাই?'

'ওরা তো নদীতে জন্মায়।'

'ধ্যাৎ! ওরা আসে হলুদ পাহাড় থেকে।'

'হলুদ পাহাড়! সে আবার কী?'

বুবুন চোখ বুজল। এক অনাবিল সুখ ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। যেন সে কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'চোখ বুজলেই আমি দেখতে পাই। বিশাল হলুদ পাহাড়। হাজার হাজার গোল্ডি। ওরা

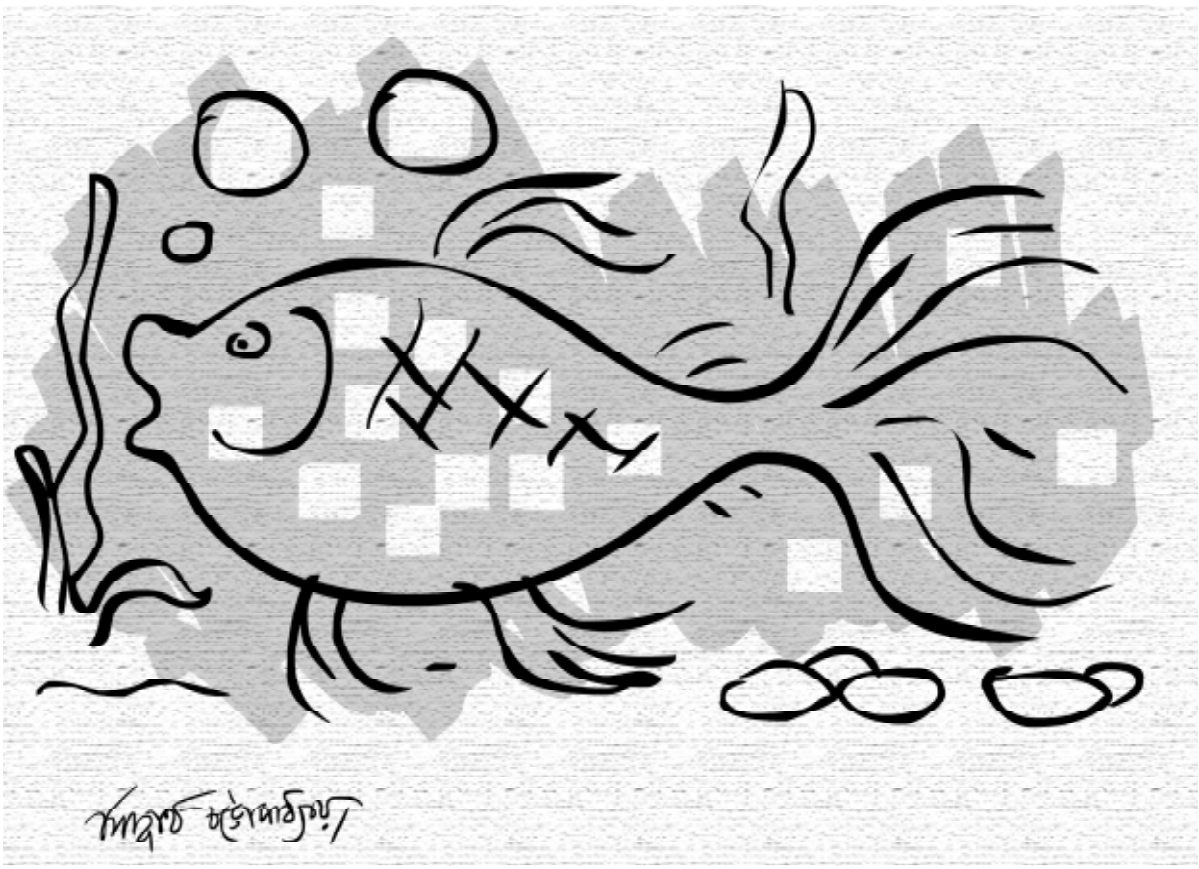

আমায় ডাকে।' বুবুন চোখ খুলল, 'ওদের কাছে আমি কবে যাব বাবাই?'

বুবুনের মাথায় হাত রেখে বললাম, 'ও তো স্বপ্ন! মানুষ কখনও মাছের সঙ্গে থাকতে পারে নাকি?'

বুবুন আবার চোখ বুজল। হলুদ আলোয় ভরে গেল ঘরটা। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞাসা করি, 'কী দেখছিস বুবুন? বন্ধুদের? আমরা তোর বন্ধু হতে পারি না?'

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলো না। বুবুন চোখ মেলে বলল, 'জানো বাবাই, ওরা সবসময় খেলে। ওদের কারও অসুখ করে না। হলুদ পাহাড়ে আমি কবে যাব বাবাই?'

অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলুদ পাহাড়ের ডাক থামল না। বুবুনের বন্ধ চোখের নীচে বন্ধুদের খেলাঘরের আমন্ত্রণ। শীতের পড়ন্ত বেলায় মৃত্যুর আশ্চর্য সম্মোহন। বুবুন তাতে বুঁদ হয়ে আছে।

বরুণা মেনে নিয়েছে। আমি পারিনি। সারাদিন নিজের সঙ্গে যুঝি। মনকে বোঝাই। আমি তো জানতাম বুবুন একদিন চলে যাবে। আমাদের কঞ্চির বেড়া একদিন ভেঙে পড়বে। মৃত্যু নিষ্ঠুরের মতো প্রথমে দখল করবে বুবুনের মন, তারপর শরীর। কিন্তু মৃত্যু তো দখল করেনি। জয় করেছে। আমার তো তাতে সুখী হওয়ার কথা। যে প্রশ্ন সব মৃত্যুপথযাত্রী যন্ত্রণায় অথবা হতাশায় করে, বুবুন করেছে খেলাচ্ছলে। যেন সারাদিন স্কুলে থাকার পর বিকেলে তার ছুটি হয়েছে। এবার সে তার বকেয়া খেলাগুলো বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চায়। হলুদ পাহাড় তার খেলাঘর। তার ছুটির পৃথিবী। কিন্তু আমার মন মানে না। আমি তো বাবা, কেমন করে যেতে দিই। বুবুনের পিঠে হাত বোলাই। মাঝে মাঝে বলি, 'তুই ভালো হয়ে যাবি। তারপর আমরা সবাই মিলে হলুদ পাহাড়ে বেড়াতে যাব।' বুবুন সাড়া দেয় না। চোখ বুজে হলুদ পাহাড়ের মাথায় বিভোর হয়ে থাকে।

প্রলয় তালুকদারকে খবর দিলাম। যদি কিছু করতে পারেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না। বুবুন প্রায় চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পেরিয়ে যাওয়াই শুধু বাকি।

মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রলয় তালুকদার।

রাত হলো। আমি আর বরুণা বুবুনের মাথার কাছে বসে আছি। যদি তার জ্ঞান ফেরে, যদি সে কিছু বলে! নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে যায়। এমনি করে তিনদিন কেটেছে। কিন্তু আজ ভোররাতে বুবুন চোখ মেলল। বরুণা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবি বুবুন?'

বুবুনের চোখ আমার দিকে, 'কাঁদছ কেন বাবাই? আমি তো আবার ফিরে আসব।'

আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। বুবুন আমার জন্য খড়কুটো ভাসিয়ে দিল। অন্তর্লীন দহনে বরুণার মায়বশত জুড়ে ছাই ছাই হয়ে যাচ্ছিল। বুবুন বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল তার ওপর। আমরা দুজনে একসঙ্গে বললাম, 'কবে আসবি বুবুন?'

বুবুন চোখ ফেরাল অ্যাকুয়ারিয়ামের দিকে। গোল্ডি খেলছে। তার দিকে আঙুল তুলে বুবুন বলল, 'এই গোল্ডিটা যেদিন হলুদ পাহাড়ে ফিরে যাবে। তোমরা কিন্তু ওকে ভালো রাখবে। ও কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পাব।'

বুবুন চলে গেল।

ডুকরে উঠল বরুণা। আমি দেখলাম শার্সিতে সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়েছে। অদ্ভুত হলুদ আলোয় ভরে গেছে বুবুনের ঘর। অ্যাকুয়ারিয়ামে অজস্র হলুদ পাহাড়। পোশাক পাল্টে গোল্ডিরা সবাই সেখানে বন্ধু। বন্ধুর পোশাক থাকে না। অসুখ থাকেব না। শুধু খেলা থাকে।

বরুণা এখনও কাঁদছে। কেন কাঁদছে বরুণা! বুবুন তো আবার ফিরে আসবে। জীবন কি কখনও শেষ হয়? রূপ মিলিয়ে যায়, কিন্তু রূপকথা ফুরোয় না। ■

With Best Comliments from -

A Well Wisher